"হাম ওহাঁ হাঁয় জাহাঁ সে হামকো
কভী কুচ্ হামারী খবর নাহী আতী!"

আমরা এমন এক স্তরে অবস্থান করছি, যেখান থেকে আমাদের নিজেদের কাছেই কোন খবর আসে না।

কোরআন নিজেও নিজেকে অত্যন্ত খোলা ও সহজ বলে, কিন্তু অন্য দিক দিয়ে অতি গভীর এবং আবৃত। এমনিভাবে আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে বলেন, তিনি যাহের এবং বাতেনও বটে।

২. বলাবাহুল্য, দুটি স্ববিরোধী বর্ণনা যদি একই ক্ষেত্রে বলা হয়, তখন অবশ্যই এ দুটি বিপরীত বিষয়ের সম্মিলন দুটি বিভিন্ন দিক দিয়ে হবে। অতএব, কোরআন মজীদের সহজ এবং কঠিন উভয়টির নিশ্চয়ই দু'টি হিসাব থাকবে। কাজেই প্রয়োজনীয় ও সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে সেটি যথেষ্ট সহজ। কিন্তু উচ্চতর শিক্ষা এবং সূক্ষ্ম বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন। এমন হওয়াই যথার্থ। কারণ, যারা উচ্চতর অগ্রগতির যোগ্যতায় পৌছুতে পারেনি, তাদের জন্য সেসব সূক্ষ্ম ও উচ্চতর বিষয়গুলো প্রকাশ করে দেয়া হলেও তারা না কিছু বুঝবে, না তার দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। বরং তাদের উপকৃত হওয়ার যে যোগ্যতা, তাতে আরও ক্ষতি সাধিত হবে। কারণ, দ্বীনের পথ হচ্ছে এক অসীম রহস্য জগতে পরিভ্রমণ। বস্তুত রহস্য জগতে ভ্রমণ করা যায় নিবিষ্ট চিন্তা-গবেষণার দ্বারা। কোন লোক যে বিষয়টি গভীর চিন্তা-গবেষণার দ্বারা অর্জন করতে পারে, যদি তা পূর্বাহ্নেই বলে দেয়া হয়, তা হলে তার চিন্তা বা গবেষণাশক্তি বিনষ্ট হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সেই বলে দেয়া বিষয়টিও সে সন্দেহাতীতভাবে বুঝতে পারবে না– যেমনটি হওয়া উচিত। তদুপরি পরবর্তী অগ্রগতি থেকেও সে বঞ্চিত হয়ে পড়বে। সেজন্যেই আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়ার জিন্দেগীতে চেষ্টাকে অত্যন্ত জরুরী সাব্যস্ত করেছেন, যাতে মানুষ তার উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত পৌছুতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যক। অন্যথায় শিক্ষা কথাটা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়বে। 'কারণ, মেধা বা বুদ্ধিবৃত্তি অকেজো হয়ে গেলে জ্ঞান নিষ্ফল হয়ে যাবে। এতো হলো বাহ্যিক জ্ঞানের কথা। আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে এর চাইতে আরও কিছুটা বেশী মনে করা যায়। কারণ, এক্ষেত্রে 'জানা' তারই নাম যাকে 'হওয়া' বলা হয়। ভাল-মন্দ জানবে অথচ আগ্রহ বা ঘৃণা সৃষ্টি হবে না, এ জানা ধর্মের ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্য নয়। কোন দার্শনিকও যদি শুধুমাত্র নামের দার্শনিক না

www.icsbook.info

হয়, তবে এমনি জানা জানে। শীর্ষস্থানীয় গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের মতও ছিল তাই। তিনি পাপ এবং মূর্খতাকে সমার্থক বলতেন।

৩. বস্তুত আল্লাহ্ তাআলার যে অভিজ্ঞান বা হেকমতের ওপর মানুষের উন্নয়ন ও অগ্রগতি নির্ভরশীল, সে অনুযায়ী কোরআনকে চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্র বলা হয়েছে এবং যাহেরকে বাতেনের ওপর নির্ভরশীল করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ আমাদেরকে প্রাথমিক নেয়ামতসমূহ দান করেই চূড়ান্ত নেয়ামতসমূহের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন। অতপর আমরা যতই চেষ্টা করতে থাকি, সে অনুপাতে সেই নেয়ামতসমূহের অধিকারী হতে থাকি। আর ন্যায়সঙ্গতও তাই। তা না হলে মর্যাদার পার্থক্য কেন? অতএব, এমনিভাবে কোরআন অনুধাবন করার ব্যাপারেও মানুষ যতই উন্নতি করতে থাকবে, ততই তার সামনে রহস্যের একের পর এক দিগন্ত উন্মোচিত হতে থাকবে। আর এভাবে প্রকৃষ্টরূপে সে তা অনুধাবন করতে এবং মেনে নিতে বাধ্য হবে। বস্তুত একথা বলাই যথার্থ যে, কোরআন তার সূক্ষ্ম বিষয়বস্তুর দিক দিয়েও যথেষ্ট প্রকৃষ্ট ও সহজ। পক্ষান্তরে তার গোপনীয় হওয়াটা শুধু এজন্যে যে, আমরা এখনও বহু পেছনে পড়ে আছি। কাজেই স্বয়ং কোরআন আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলেঃ "যারা আলো গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাদের জন্য আলোকে বাড়িয়ে দেন।" সাধারণ শিক্ষা বা জ্ঞানার্জনের বেলায়ও একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। লেখা যতই পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হোক অ-আ-ক-খ পড়ুয়াদের জন্য তাই নিতান্ত জটিল হয়ে থাকে। কিন্তু একজন বিজ্ঞ পন্ডিতের জন্য তা জটিল বলাটা নিতান্তই অন্যায়। কোরআনও নিজের গুণ বর্ণনা প্রসংগে তার গভীরতা ও গোপনীয়তার কথা উল্লেখ করেছে। গ্রন্থের ললাট দেশেই এমন তিনটি অক্ষর লেখে দেয়া হয়েছে, যার অর্থ এত চেষ্টা সত্ত্বেও অদ্যাবধি প্রকাশ পায়নি। এই তাৎপর্যপূর্ণ পথের পহেলা পদক্ষেপেই যেন এই শিরোনাম লাগিয়ে দেয়া হয়েছে,– আর তাকে শুধু প্রথমে লাগানো হয়েছে তাই নয়, বরং আরো জায়গায় যতি ক্ষেত্রের মাথায় একই লেখা টাংগিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে পথিক ঘটনাচক্রে এক জায়গায় ভুল করে ফেললেও অন্য জায়গায় স্মরণ করে নিতে পারে।

৪. কোরআন পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করে দিয়েছে যে, এই সাগর থেকে আপন আপন পাত্র অনুযায়ী পানি ভরে নাও। গোটা সাগর লোটায় ভরে নেয়ার লোভ করো না। সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়টি ভাল করেই জানতেন ও বুঝতেন। কোথাও কোন কিছু বোধগম্য না হলে অনর্থক তার পেছনে জড়িয়ে পড়তেন না।

www.icsbook.info

কারণ, হেদায়াতের জন্য যতটা প্রয়োজন কোরআনের সে অংশটুকু অত্যন্ত প্রকৃষ্ট ছিল।

সাগর পাড়ি দিয়ে তারা নিজের লক্ষ্যে পৌছতেন ঠিকই, কিন্তু গোটা সাগরের রহস্য উদঘাটন করতে যেতেন না। তাঁরা তাকে সীমাহীন এবং অনন্তই মনে করতেন। অবশ্য প্রত্যেকেই নিজের মেধা ও মস্তিষ্কের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী তা থেকে নির্যাস বের করে নিতেন। আর সাধারণ রাজপথের দু'পাশে যে মনোরম দ্বীপমালা পড়েছিল, তাঁরা সেগুলোই আবিষ্কার করতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-"এ সাগরের বিস্ময় কখনও শেষ হবার নয়।"

৫. যারা কোরআনকে একটা সাধারণ কালাম বলে ধারণা করে এবং নিজের যোগ্যতা তার চাইতে বেশী মনে করে, তারা ভাবে, কোরআন অনুধাবন করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, তারা কোরআনের মর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত থেকে যায়। তাদের অনেকে নিজের বক্র বুদ্ধিকে আপত্তি উত্থাপন বা প্রশ্ন বলে অভিহিত করে। অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যারা কোরআন কিছুটা অনুধাবন করতে পেরেছেন, তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী একে অনুধাবন করার জন্য প্রাথমিক বিষয়টি হচ্ছে, একে একটা উন্নত মানের কালাম বলে মেনে নিতে হবে। কোরআন পাক নিজেও নিজের সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থানে এ কথাই বলেছে যে, যারা অস্বীকার করে তারা একে কখনও অনুধাবন করতে পারে না। হযরত ঈসা (আঃ)-কে যখন তাঁর জনৈক শিষ্য জিজ্ঞাসা করলেন যে, উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষা দেন কেন? তখন তিনি বলেছিলেন, "যাতে বিষয়টি অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, তারা শুনেও শুনে না, দেখেও দেখে না।" কোরআন নিজের ব্যাপারে বলেছে– "এতে অসদাচারীদের অসদাচরণ আরও বেড়ে যায়।" অতএব সব সময়ই এমনি হয়ে এসেছে। যারাই সত্যকে মেনে নেয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন এবং সত্য পথে চলতে শুরু করেছেন; এগিয়ে গেছেন সামনের দিকে। কিন্তু যারা গড়িমসি করেছে, তারা উদ্দেশ্য কিংবা লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত পৌছুতে পারেনি। আর যারা বিমুখতা অবলম্বন করেছে, তারা সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেছে। তার কারণ, তারা যে বুদ্ধি এবং বিবেচনাশক্তিকে প্রতিটি কাজে নিজেদের পথপ্রদর্শক সাব্যস্ত করে নিয়েছিল, সে বুদ্ধিই তাদেরকে যখন সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে, তখন তারা তার প্রতি অনীহা প্রকাশ করে বলেছে, এই

৮ –

www.icsbook.info

কালামটিতে জাদু রয়েছে। ফলে আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি সব উলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। বস্তুত তারা বুদ্ধির ওপর নিজেদের কামনা-বাসনাকে স্থান দিয়েছে এবং অহেতুক সন্দেহ দাঁড় করিয়ে নানারকম ছল-চাতুরীর পথ অবলম্বন করেছে, যাতে নিজের নির্বুদ্ধিতার ওপর একটা আবরণ দিয়ে দিতে পারে। কারণ, প্রকৃতি অন্ধকারকে সদাই ঘৃণা করে। সুতরাং তারা যখন বুদ্ধির চোখে এভাবে পট্টি বেঁধে দিয়েছে, তখন বলাই বাহুল্য, যা-ও এক-আধটু আলো বেঁচেছিল, তাও হারিয়ে বসল। এই অবস্থাটিই কোরআন বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছে। তা ছাড়া ইঞ্জীলেও এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। —(সূরা ইখলাসের তাফসীরের ভূমিকা)

যাকে সম্বোধন করা হয় তার সম্বোধনের ভিত্তিতে কোরআনের জটিলতা ঃ

আলোচনার শুরুতেই আমরা লেখেছি, কোন একটি বক্তব্য কারো জন্য খুবই সহজ এবং কারো জন্য খুবই জটিল হতে পারে। কোরআন মজীদের ক্ষেত্রে এদিক দিয়েও লক্ষ্য করা প্রয়োজন। বলাবাহুল্য, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আমলের মুসলমানদের জন্যে কোরআন মজীদ ছিল যথেষ্ট সহজবোধ্য। কিন্তু সে সহজবোধ্যতা পরবর্তী যুগের লোকদের জন্যে রয়নি। কারণ, তারা নিজেদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনাবলী, আপন যুগের প্রচলিত নিয়ম-রীতি এবং নিজের জাতির বিশ্বাস ও কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। কোরআন যেকোন বিষয়ে যেকোন ইশারা-ইঙ্গিত করেছে, সঙ্গে সঙ্গে তারা তা বুঝে নিতে পারতেন। এমনকি সেসব আয়াতসমূহ বুঝতেও তাঁদের কোন জটিলতার সম্মুখীন হতে হত না, যাতে কোন বিশেষ ঘটনা কিংবা কোন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে ও সূক্ষ্ম ইশারা বা ইঙ্গিত করা হত। কোন একটি আয়াত অবতীর্ণ হল আর তার কোন একটা শব্দে তাঁরা কোন বিশেষ ইঙ্গিত-সংকেতের গন্ধ পেলেন কি না পেলেন, সাথে সাথে তার যথার্থ লক্ষ্যের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে দিতেন এবং উদ্দেশের গভীরতা পর্যন্ত এমনভাবে পৌঁছে যেতেন যেন রাখাঢাকা কোন বিষয়ই ছিল না। বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝতে চেষ্টা করা যাক। কোরআন মজীদের বহু আয়াত আছে, যাতে আবু লাহাব সম্পর্কে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেসব আয়াতে যে ব্যক্তিত্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তার প্রতি সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টি যত সহজে পড়তে পারত, তত সহজে আমাদের দৃষ্টি সেদিকে ধাবিত হতে পারে না। তাঁরা আকার-অবয়ব সম্পর্কে ভাল করে জানতেন বলে

www.icsbook.info

অদৃশ্য রসনা থেকে কোন একটি কথা নিঃসৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্বিঘ্নে তার উদ্দেশ্য বুঝে নিতেন। কোন কোন আয়াতে সাহাবাদের কারো কোন বিশেষ প্রশংসা অথবা কারো কোন বিশেষ কাজের নিন্দা করা হলে তা কোরআন অবতরণকালের লোকেরা যত সহজে ধরে নিতে পারতেন, পরবর্তী শতাব্দীসমূহের লোকদের পক্ষে সে বিষয়টি যে তত সহজে ধরে নেয়া সম্ভব নয়, তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

আমল-আকীদার ব্যাপারটিও একই রকম। কোরআন মজীদে এমন একটি সূরাও হয়ত নেই, যাতে সেযুগের বিশ্বাস কিংবা কাজ-কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি। কিন্তু যেভাবে প্রসিদ্ধ কোন বিষয় বর্ণনা করা হয়, তেমনি সংক্ষিপ্তভাবে সেগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে দেয়া হয়েছে; বিস্তারিত বর্ণনারীতি তাতে অবলম্বন করা হয়নি। যেমন, সূরা আনআমে আরবদের কোন কোন কাজ বা আমল ও বিশ্বাস বা আকীদা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ـ وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ـ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ـ وَقَالُوْا هٰذِهٖ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا اِلَّا مَنْ نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ـ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ـ وَقَالُوْا مَا فِىْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰى اَزْوَاجِنَا وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَاءُ ـ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ـ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ـ (انعام ١٣٧ -- ١٤١)

আর তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট ফসল ও চতুষ্পদ পশুসমূহের মধ্যে একটা অংশ সাব্যস্ত করল এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলল, এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র জন্যে আর এটা আমাদের (অন্যান্য) অংশীদারদের জন্যে। বস্তুত যে অংশটি তাদের অংশীদারদের জন্যে সাব্যস্ত তা আল্লাহ্ পেতে পারেন না, আর যে অংশটি

www.icsbook.info

আল্লাহ্‌র জন্যে তা তাদের অংশীদাররা পেতে পারে। কি যে মন্দ সিদ্ধান্ত! তেমনিভাবে অনেক মুশরিকের দৃষ্টিতে তাদের অংশীদাররা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করার বিষয়টিকে উত্তম করে দেখিয়েছে, যাতে তাদেরকে ধ্বংসে পতিত করা যায় এবং যাতে তাদের ধর্মকে তাদের কাছে সন্দিগ্ধ করে তোলা যায়। আর যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তা হলে তারা এমনটি করতে পারত না। সুতরাং তাদের এবং তাদের নিন্দাবাদ ছেড়ে দাও। আর তারা বলে, এই চতুষ্পদ এবং ফসল অস্পৃশ্য; এগুলো খেতে পারবে না, কিন্তু আমরা যদি ইচ্ছা করি তবে তা স্বতন্ত্র কথা। নিজেদের ধারণা অনুযায়ী আরও কিছু চতুষ্পদ জীব রয়েছে, সেগুলোর পিঠ হারাম এবং কিছু চতুষ্পদ রয়েছে, যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয় না, আল্লাহ্‌র প্রতি নিন্দাচ্ছলে। আল্লাহ্ তাদের নিন্দাবাদের শীঘ্রই তাদেরকে প্রতিফল দেবেন। আর তারা বলে, এই চতুষ্পদের পেটে যে বাচ্চাটি রয়েছে, তা পুরুষদের জন্যে নির্ধারিত এবং আমাদের স্ত্রীদের জন্য হারাম। আর যদি তা মৃত জন্মায়, তা হলে তারা তাতে সমান সমান অংশীদার হবে। আল্লাহ শীঘ্রই তাদেরকে (স্বকল্পিত) বিশ্লেষণের বদলা দেবেন। নিঃসন্দেহে তিনি অভিজ্ঞানসম্পন্ন, জ্ঞানী। তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা বোকামির দরুন কোন রকম জ্ঞান-বুদ্ধি ছাড়াই নিজেদের সন্তানদের হত্যা করে দিয়েছে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে যে জীবিকা দান করেছেন, সেগুলোকে আল্লাহ্‌র প্রতি বিদ্বেষবশত হারাম করেছে। এরা ভ্রষ্ট হয়ে গেছে; সরল পথে নেই।

এ আয়াতগুলোতে কিছু কাল্পনিকতা ও কুসংস্কারের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এর বর্ণনাভঙ্গি সংক্ষিপ্ত ও ইংগিতপূর্ণ। এতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, যাদেরকে এই কাহিনী শোনানো হচ্ছে তারা সে সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। কাজেই ভাষালংকারের দাবী ছিল যেন এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া না হয়। কিন্তু পরবর্তীদের জন্যে, যারা সে যুগটি শেষ হয়ে যাবার পর এসেছে, ঐসব সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত যথাযথ বুঝে ওঠা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। সে সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে তাদের মনে বহু প্রশ্ন দেখা দেবে, যার উত্তর দিতে গিয়ে সে যুগের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ও কার্যকলাপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া অপরিহার্য।

ব্যাপারটি আরও একটা উদাহরণের মাধ্যমে বুঝে নেয়া যায়। সূরা আন্‌ফালে বলা হয়েছে ঃ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً

www.icsbook.info

খানায়ে কা'বার সামনে তাদের নামায তালি বাজানো আর শীষ দেয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

আজকের দিনে আরবদের সে এবাদত-উপাসনার স্বরূপ কল্পনা করাটা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু যে যুগে কোরআন নাযিল হয়েছিল, তখনকার লোকদের জন্যে এর চাইতে সাধারণ ও জানা বিষয় আর দ্বিতীয় একটিও হতে পারত না। তারা শুধু যে নামাযের পরিপূর্ণ রূপ ও তাৎপর্য জানতেন তাই নয়, বরং ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নিজেরাও এ নামাযই পড়তেন।

আরো একটি উদাহরণ সূরা আ'রাফ থেকে নেয়া যায়। বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَا اٰبَاءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔

আর যখন কোন অশ্লীল কাজ করে, তখন বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এ কাজ করতে দেখেছি। তা ছাড়া আল্লাহ্ আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন। বলে দাও, আল্লাহ্ অশ্লীলতার নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্র প্রতি এমন কাজের অপবাদ আরোপ করছ, যার ব্যাপারে তোমাদের জানা নেই?

কোরআন নাযিল হওয়ার যুগে যারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা বুঝেছেন, মক্কাবাসীর উলঙ্গ অবস্থায় খানায়ে কা'বা তওয়াফের সাথে আয়াতটি সম্পৃক্ত। অথচ এতে উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করার কথা কোথাও উল্লেখ নেই। বেশীর চেয়ে বেশী সূক্ষ্ম একটা ইঙ্গিত রয়েছে মাত্র। কিন্তু বক্তব্যের আনুপূর্বিক ধারাটা এমন ছিল যে, যারা মক্কাবাসীর সে অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তাদের ধারণা শুধু সেদিকেই ধাবিত হতে পারত। অবশ্য পরবর্তী যুগের লোকদের বিষয়টি যথাযথ বুঝতে গিয়ে বিরাট জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তার কারণ, তাদের সামনে ছিল শুধুমাত্র বক্তব্যের আনুপূর্বিক যোগসূত্র; সে অবস্থা ও পরিবেশ তাঁদের সামনে ছিল না, যদ্দরুন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল। যদিও শব্দাবলী এবং বক্তব্যের আনুপূর্বিক যোগসূত্র যথার্থ উদ্দেশের প্রতি পথনির্দেশের জন্য অপর্যাপ্ত নয়, তবুও সেই সংগে পরিবেশ এবং পরিস্থিতিরও যদি সাহায্য পাওয়া যায়, তা হলে প্রকৃত বাস্তবতা আপনিই সামনে এসে যায়।

www.icsbook.info

উল্লিখিত আয়াতটির সাথে সাথেই বলা হয়েছে ঃ

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ـ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ـ (اعراف ٣١ - ٣٢)

হে আদম সন্তানগণ! প্রত্যেকবার মসজিদে সমবেত হওয়ার সময় তোমরা উত্তম সজ্জা গ্রহণ করে নাও এবং পানাহার কর আর অপব্যয় করো না। কারণ, আল্লাহ্ অপব্যয়ীকে পছন্দ করেন না। তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে হারাম করল আল্লাহ্র সাজ সজ্জাকে, যা তিনি বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র রুজিকে, যা তিনি বান্দাদেরকে দান করেছেন?

এ আয়াতটিও উপরোল্লিখিত বিষয়ের সাথেই সম্পৃক্ত। এতে উলঙ্গ তওয়াফ করার আসল দর্শনটা বুঝা যাচ্ছে যে, আরবদের এই বোকামিসুলভ কাজটি তাদের অন্যান্য বহু কাজের মতই প্রকৃতপক্ষে একটা আবেগ নির্ভর আচরণ ছিল। এই নির্লজ্জ কাজটি তারা এজন্যে গ্রহণ করেছিল যে, তারা একে বৈরাগ্য ও পরহেযগারী বলে ধারণা করত। তাদের ধারণায় পোশাক-পরিচ্ছদ হল দাম্ভিকতা ও শোভ-সৌন্দর্যের বস্তু-সামগ্রী। কাজেই তারা তওয়াফের সময় তা খুলে ফেলত, যাতে আল্লাহর ঘরের তওয়াফ সেই পার্থিব মলিনতা থেকে পবিত্র থাকে। কোরআন মজীদ উল্লিখিত আয়াতে তাদের সে ধারণার খন্ডন করেছে যে, আল্লাহ্-ভক্তির এহেন ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, আল্লাহ যেসব নেয়ামত বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো মানুষ নিজের জন্যে হারাম করে রাখবে। বরং এই নেয়ামতসমূহের দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। কারণ, সেগুলো সৃষ্টির উদ্দেশ্যই আল্লাহ্র বান্দাদের উপকার সাধন। অবশ্য অপব্যয় নাজায়েয। এ থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য।

বলাবাহুল্য, উক্ত আয়াতের যথার্থ মর্ম অনুধাবন করতে পারা উলঙ্গাবস্থায় তওয়াফ করার দর্শনটির অবগতির ওপর নির্ভরশীল, যদিও এই দর্শনটি আয়াতের শব্দাবলী থেকেই বেরিয়ে আসছে। বরং এ বিষয়টি মেনে নেয়া ছাড়া আয়াতটির কোন যথার্থ ব্যাখ্যা করাই সম্ভব নয়। কিন্তু এর শব্দগুলোতে এমন ব্যাপকতা রয়েছে, যদি বিষয়গুলো সামনে না থাকে এবং বক্তব্যের পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য না করে, তা হলে আয়াতটির যথার্থ উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছুতে গিয়ে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু যাঁদের সামনে এসব কার্যকলাপ এবং

www.icsbook.info

দর্শন উভয়টিই রয়েছে, তাঁদের পক্ষে আয়াতটি বুঝতে গিয়ে কি অসুবিধা থাকতে পারত? উপাখ্যান যেহেতু নিজেদেরই ছিল, তাই কথাটি মুখ দিয়ে বের হওয়ার সাথে সাথে তার যাবতীয় তাৎপর্য আয়নার মত সামনে এসে উপস্থিত হয়ে গেল। এমনি করে সূরা বাকারায় হজ্জের আহকাম বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ـ

(بقرة - ٦٠٠)

হজ্জের যাবতীয় ফরযগুলো যখন সম্পাদন করে ফেলবে তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো, যেমন করে স্মরণ করতে নিজেদের পিতা-পিতামহের কথা, বরং তার চেয়েও বেশী করে স্মরণ করো।

পূর্ববর্তী ওলামা-মনীষীদের কাছ থেকে আমাদের কাছে كذكر كم اباءكم এর যে ব্যাখ্যা এসে পৌঁছেছে, তাতে বলা হয়েছে ঃ

وكانوا اذا قضوا مناسكهم وقفوا بين المسجد بمنى وبين الجبل فبعد دون فضائل اباء هم ويذكرون محاسن ايامهم ـ

হজ্জের আরকান ও ফরযসমূহ সম্পাদন শেষে লোকেরা মিনায় অবস্থিত মসজিদ এবং পাহাড়ের মাঝামাঝি এক জায়গায় বসে পড়ত এবং নিজেদের পিতা- পিতামহের গৌরব ও তাদের কৃতিত্বের কথা বর্ণনা করত।

আয়াতের শব্দাবলী যদিও উল্লিখিত বিবরণের দিকে ইঙ্গিত করেছে, কিন্তু এই ইঙ্গিত ধরে নেয়া তাদের পক্ষে সহজ নয় যারা পরিস্থিতি, ঘটনাস্থল এবং আরবদের রুচি সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে ওয়াকিফহাল নয়। অবশ্য যারা কোরআন নাযিলের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং তখনকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তাঁদের পক্ষে বিষয়টি বুঝা মোটেই কঠিন নয়।

তেমনিভাবে যেকোন কালের কথা ও বক্তব্য তখনকার অসংখ্য কৃষ্টিগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের সাথে জড়িত থাকে। ফলে সে কথাটির প্রকৃত সৌন্দর্য, তার যথার্থ বলিষ্ঠতা তখনও পর্যন্ত উপলব্ধি করা যায় না, যতক্ষণ না সে কথা বা বক্তব্যের পরিবেশ নিজের আশেপাশে তৈরী করে নেয়া যায়। যেমন, কোরআনের এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ

www.icsbook.info

الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ـ

তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে পারস্পরিক বন্ধুত্বের জন্য পার্থিব জীবনে অন্য আশ্রয় বানিয়ে নিয়েছ। অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে অভিসম্পাত করবে। বস্তুত তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম, আর তোমাদের কোন সহায় থাকবে না।

এ আয়াতে- مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا অংশটির প্রতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এতে তৎকালীন রাজনীতির একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা বুঝতে না পারলে আয়াতটির ব্যাখ্যায় কোন কোন অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক আবরণমুক্ত হতে পারে না।

আরব এবং অন্যান্য পৌত্তলিক জাতিসমূহে পৌত্তলিকতাটা শুধু একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসই ছিল না, বরং তাদের যাবতীয় রাজনৈতিক এবং সামগ্রিক সম্পর্কও এরই সাথে জড়িত ছিল। ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের পৃথক পৃথক মূর্তি ছিল এবং প্রচলিত নিয়ম ছিল। কোন্ গোত্র যখন অন্য কোন গোত্রের সাথে ঐক্য স্থাপন করতে চাইত, তখন তারা সে গোত্রের মূর্তির উপাসনায় অংশ নিত। আবার যখন কোন গোত্র অপর গোত্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইত, তখন এই বিচ্ছিন্নতার ঘোষণা করে দিত। এরপরে পারস্পরিক সমস্ত রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেত। লক্ষ্য করার বিষয়, যাঁদের সামনে বাস্তব এই পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল, তাদের পক্ষে এ আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করতে কি অসুবিধা হতে পারে? শুনল আর বুঝে নিল। কিন্তু আমরা, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সময়কার রাজনীতি সম্পর্কে সম্যক অবগত হতে না পারব, এই শব্দসমষ্টির তাৎপর্য কিংবা এতে যে বলিষ্ঠতা রয়েছে তার কি বুঝব?

এ বিষয়টিরই বিশ্লেষণকল্পে সূরা বাকারার সে আয়াতটিও একটি চমৎকার উদাহরণ, যা মদ্যপান ও জুয়ার নিষেধাজ্ঞা প্রসংগে অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ـ (بقره - ٢١٢)

তারা তোমার কাছে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এগুলোতে মহাপাপ রয়েছে এবং মানুষের জন্যে কিছু উপকারিতাও বটে। তবে সেগুলোর পাপ উপকারিতার তুলনায় অনেক বেশী।

www.icsbook.info

এ আয়াতটি সম্পর্কে একটি সাধারণ ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে। মানুষ মনে করে, মদ্যপান ও জুয়ার যে উপকারিতার কথা কোরআন স্বীকার করেছে, সেগুলো তাদের চিকিৎসা বিষয়ক এবং ব্যক্তিগত। অথচ কথাটি কোনক্রমেই ঠিক নয়। কোরআন যে উপকারিতার কথা স্বীকার করেছে, তা হচ্ছে তাদের কৃষ্টিগত, নৈতিক ও সামাজিক উপকারিতা। কোন বস্তুর চিকিৎসা বিষয়ক এবং ব্যক্তিগত উপকারিতা একে তো কোরআনের আলোচ্য বিষয় নয়, দ্বিতীয়ত যদি মদে কিছু উপকারিতা থেকেও থাকে, তবে দুনিয়ার এমন কোন্ ক্ষতিকর বস্তুটি রয়েছে, যাতে উপকারিতারও একটা না একটা দিক বিদ্যমান নেই? তা হলে মদ আর জুয়ার ভেতরে এমন কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার জন্য কোরআন মজীদকে সেগুলোর হারাম হওয়ার কথা ঘোষণা করতে গিয়ে সেগুলোর উপকারিতার বিষয়টিও স্বীকার করতে হবে? অন্যান্য বহু বস্তু হারাম করা হয়েছে। সেগুলো কি সম্পূর্ণভাবেই উপকারিতা বিবর্জিত ছিল? তা যদি না হয়ে থাকে, তবে সেগুলোর সম্পর্কে এই স্বীকৃতি দেয়া হল না কেন? শূকরের মধ্যে কি উপকারিতার কোন একটি দিকও ছিল না?

আমাদের মতে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এ ভুলের সংশোধনকল্পে অবশ্য আয়াতে উল্লিখিত نفع ও اثم (নাফা ও ইস্‌ম্) দুটি শব্দের তুলনাই যথেষ্ট। যদি বিষয় দুটির ব্যক্তিগত উপকারিতা-অপকারিতার প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য হত, তাহলে نفع (নাফা) বা উপকারিতার বিপরীতে ضرر (জরর) বা অপকারিতা কিংবা এরই সমার্থক কোন শব্দ আসত। اثم (ইস্‌ম্) পাপ শব্দটি আসত না, যা কিনা আরবী ভাষায় দৈহিক অপকারিতা অথবা তার অর্থে ব্যবহৃত হয় না, বরং নৈতিক স্খলন বুঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়।

কারও মনে হয়ত প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, মদ বা শরাব এবং চিকিৎসা কিংবা ব্যক্তিগত উপকারিতার বিষয়টি তো সহজই ছিল যে, তার কোন কোন দিক ছিল মোটামুটিভাবে জানা। কিন্তু সেগুলোর সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক উপকারিতা আবার কি, যা কোরআন স্বীকার করে নিয়েছে? এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর আজ কালকার লোকদের জন্য সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যথেষ্ট কষ্টকর। কারণ, যে মদ্যপান ও জুয়া খেলা আমাদের সামনে রয়েছে, তা আপাদমস্তক ক্ষতিকর ও হাঙ্গামা সৃষ্টির কারণ। এতে উপকারিতার সামান্যতম সম্ভাবনাটিও নেই। এগুলো শরীর, মন, ব্যক্তি, সমাজ সবার জন্যেই সমানভাবে অভিশাপ। অবশ্য আরবদের মধ্যে মদ্যপান ও জুয়ার সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক দিক দিয়ে একটি গুরুত্ব ছিল।

www.icsbook.info

তাদের সমাজে এতদুভয় দুরাচারই সদাচারের পথ ধরে ঢুকত। তারা এ দুটি জিনিসকেই মেহমানদারী বা আতিথেয়তা এবং দানশীলতার সবচেয়ে বড় উপকরণ বলে জানত। সে কারণেই তারা সেসব লোককে অত্যন্ত হেয় দৃষ্টিতে দেখত, যারা মদ্যপান এবং জুয়া থেকে বিরত থাকত। যারা তৎকালীন সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত তারা আমাদের এই বিবৃতি অস্বীকার করতে পারেন না। জাহেলিয়াত আমলের যেকোন কবির কবিতা পড়লেই দেখা যাবে, তারা সে দুটি জিনিসকেই সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ হিসেবে উপস্থাপন করবেন, যাকে আমাদের বর্তমান সমাজে সবচাইতে খারাপ বলে মনে করা হয়। কারণ, গরীবদের সহায়তা, আত্মীয়-বন্ধুদের আপ্যায়ন-অভ্যর্থনা, বেওয়া-বিধবাদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং অনাথ -এতীমদের সাহায্যের সবচেয়ে বড় ব্যবস্থা এ দুটি বিষয়ের মাঝেই নিহিত ছিল।

আরবের অতিথিপরায়ণ এবং সুরাসক্তদের রীতি ছিল, শীতের সময়ে যখন আরবে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত, তখন তারা মদ্যপানের আসর বসাত এবং শরাবের নেশায় বিভোর হয়ে বহু মূল্যবান উট জবাই করে সেগুলোর মাংস একত্রে স্তূপীকৃত করে সেগুলোকে বাজিতে লাগিয়েই জুয়া খেলত এবং যারা জিতত তারা মাংসগুলো গরীব- দুঃখীদের মাঝে বিতরণ করে দিত।

জুয়া এবং শরাবের এই ছিল মহিমা, যার ভিত্তিতে কোরআনে যখন সেগুলো হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়, তখন মানুষ অবাক হয়ে যায় যে, এমন একটা জনহিতকর উপকারী বিষয়কে ইসলাম হারাম করল কেন? কোরআন তাদের উত্তরে এ বিষয়টি অবশ্য স্বীকার করে নিল যে, শরাব এবং জুয়ায় কোন কোন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উপকারিতা অবশ্যই আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ সত্যটিও প্রকাশ করে দিয়েছে যে, এগুলোর সাংস্কৃতিক অপকারিতার তুলনায় এগুলোর উপকারিতার দিকটা অতি নগণ্য। সে কারণেই এগুলোকে নিষিদ্ধ ও হারাম করা যাচ্ছে।

এ বিষয়টিও স্মরণ রাখার যোগ্য যে, কোরআন মদ-জুয়ার আলোচনা অতিথি পরায়ণতার শিক্ষা প্রসঙ্গে করেছে, যাতে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ জিনিসগুলো আরবদের মধ্যে দুরাচার নয় বরং মহদাচারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা এগুলো শুধু ভোগ-বিলাস ও খেলাধুলা হিসেবেই গ্রহণ করেনি, বরং সমাজের একটা বিরাট মহিমা মনে করে গ্রহণ করেছিল।

www.icsbook.info

এখন চিন্তা করা প্রয়োজন যে, এসব উপাখ্যান যাদের জানা ছিল, তাদের পক্ষে قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (বলে দাও, এগুলোতে মহাপাপ রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারিতাও আছে।)-এর প্রকৃত তাৎপর্য পর্যন্ত পৌঁছতে জটিলতাটা কি ছিল, কিন্তু পরবর্তী যুগে যখন এ সমস্ত বিষয় দৃষ্টির অন্তরাল হয়ে গেছে, তখন ব্যাখ্যার এ দিকটি কেমন করে মানুষের সামনে আসতে পারত?

বিষয়টি আরও অধিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন মনে করলে সূরা নূরে লক্ষ্য করা যেতে পারে। তাতে সামাজিক সংস্কারের ব্যাপারে বেশ কতিপয় নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যত সেগুলো বুঝতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু গভীরভাবে তলিয়ে সেগুলোর উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গমের চেষ্টা করতে গেলে তৎকালীন সমাজের অবস্থা সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগে এবং মনে হয়, বক্তব্য তার বিশ্লেষণের জন্য এসব বিষয়ে অবগতির অপেক্ষা রাখে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে যে পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে পরিস্থিতিটি সামনে না আসে, মনের সন্দেহ দূর হয় না। তেমনি সূরা বারাআত প্রভৃতিকে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে সে যুগের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, বিপ্লব -আন্দোলন এবং সমস্ত ধর্মীয় দলগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যা ইসলামের আর্বিভাবের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল।

যা হোক, প্রত্যেক যুগের বাণীতেই সে যুগের সংস্কৃতি, নৈতিকতা, রাজনীতি ও ধর্মের এমন সব তাৎপর্য নিহিত থাকে, যেগুলো জানা ছাড়া সেই বাণীর বহু গুণ-বৈশিষ্ট্য ও সূক্ষ্মতা পরিষ্কারভাবে বিকশিত হতে পারে না। বস্তুত এ বিষয়টি শুধু কোরআনের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, বরং যেকোন বাণীর বেলায়ই তাই। হোমার এবং শেক্সপিয়ারকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে হলেও তাই করতে হয়। বহু বাহ্যিক বিষয়ের সাহায্যে নিজেদের চারপাশে হোমার ও শেক্সপিয়ারের পরিবেশ সৃষ্টি করে নিতে চেষ্টা করি আমরাও। হোমার-শেক্সপিয়ার তো তবুও বহু প্রাচীন কাহিনী। তাদের সংস্কার আর আমাদের সংস্কারের ব্যবধান শুধু যুগেরই নয়, বরং উভয়ের বর্ণ-গোত্র এবং দেশ-আবাসও বিভিন্ন। মীর এবং গালেবকেই ধরা যাক। তাঁরা তো আমাদের এ উপমহাদেশেরই কবি ছিলেন, কিন্তু তাঁদেরকে বুঝতে গিয়ে কি আমাদের সেসব বিষয়গুলোর মুখাপেক্ষী হতে হয় না।

আল-ইসলাহ-এর প্রথম সংখ্যায় ইমাম হামীদুদ্দীন ফারাহী (রঃ) প্রণীত 'কোরআনের বিন্যাস ও সংবিধান' শীর্ষক প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি লাইন গভীর মনোযোগসহ পড়া যেতে পারে।

www.icsbook.info

১. কোরআন যে যুগে নাযিল হয়েছিল, তার সম্যক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

২. আমাদের জানা প্রয়োজন, তখনকার ইহুদী, খ্রীস্টান, মুশ্‌রিক ও অন্যান্যদের ধর্ম- বিশ্বাস কি ছিল।

৩. আমাদের প্রয়োজন আরবের সাধারণ সংস্কার-কুসংস্কারগুলো আবিষ্কার করা।

৪. আমাদের জানা প্রয়োজন, কোরআন নাযিল হওয়ার সময় নতুন কি কি ঘটনা ঘটেছিল এবং তাতে আরবদের বিভিন্ন দলের মধ্যে কি ক্রিয়া -প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। কি কি দেশী ও সামাজিক ঝগড়া সৃষ্টি হয়েছিল এবং গোটা আরবে কি আলোড়ন ঘটে গিয়েছিল?

৫. আমাদের আরও জানা দরকার, তখন আরবের সাহিত্য রুচি কি ছিল। তারা কোন্ ধরনের কথাবার্তা শুনতে এবং বলতে অভ্যস্ত ছিল। তখনকার আসর-বৈঠকে তাদের বক্তব্য কেমন করে উপস্থাপন করত। রহস্যজনক ও সংক্ষিপ্ত বিষয়সমূহ এবং ভাষার অলঙ্কার ও গঠন প্রভৃতি ব্যাপারে কোন্ প্রণালীকে তারা কেমন করে ব্যবহার করত?

৬. এবং অতঃপর আমাদের এ কথাও জানতে হবে যে, আরবদের ধারণায় নৈতিকতার ভাল ও মন্দের মাপকাঠি কি ছিল?

পূর্ববর্তী মনীষীদের তফসীর রীতি ঃ

উল্লিখিত কারণেই পূর্ববর্তী প্রবীণ ওলামা-মনীষীদের তফসীরের রীতি ছিল এই যে, তাঁরা সর্বপ্রথম কোরআনকে কোরআনের সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করতেন। তারপর কোন জটিলতা থেকে গেলে সেগুলোর সমাধান অনুসন্ধান করতেন হুযূর আকরাম (সঃ)-এর বাণী ও তাঁর কাজকর্মে। তারপরেও যদি কোন বিষয়ের কোন দিক বিশ্লেষণসাপেক্ষ রয়ে গেলে তার সমাধানের উদ্দেশে সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনা-বিবৃতির সাহায্য নিতেন। কারণ কোরআন মজীদ সেসব লোকের অবস্থা ও ঘটনাবলীর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যাদেরকে সে সর্বপ্রথম সম্বোধন করেছে, তাঁরা কোরআন মজীদের তত্ত্ব-রহস্য এবং তার ইঙ্গিত ও তাৎপর্যসমূহ যত সুন্দরভাবে বুঝতে পারতেন, তেমনটা আর কারও পক্ষে, বিশেষত, যাদের

www.icsbook.info

তখনকার অবস্থা সম্যকভাবে জানা নেই, সম্ভব ছিল না। সুতরাং আল্লামা সুয়ুতী তাঁর 'এত্কান'-এ তফসীরের নিয়ম বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

আলেমগণ বলেছেন, কেউ যদি কোরআন মজীদের তফসীর করতে চায়, তা হলে প্রথমে কোরআন মজীদের মাধ্যমেই তার তফসীর করা উচিত। এতে এক জায়গায় যে বিষয়ের বর্ণনা দুর্বোধ্যভাবে, রয়েছে অন্যত্র তার ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে। আর যে বিষয়টি একখানে সংক্ষিপ্ত অন্যত্র তা বিস্তারিত বলা হয়েছে। ইবনে জাওযী (রঃ) একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাতে কোরআনের সেসব আয়াতের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন যেগুলো এক জায়গায় দুর্বোধ্য অন্যত্র বিস্তারিত। কিন্তু আমি দুর্বোধ্য বিষয়গুলোর ব্যাপারে সেগুলোর উদাহরণসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করেছি। কোথাও তাতে ফল না হলে (অর্থাৎ কোরআনের তফসীর কোরআনেরই দ্বারা সম্ভব না হলে) সুন্নত বা হাদীসে তার তফসীর সন্ধান করতে হবে। কারণ, সুন্নত হল কোরআনের ব্যাখ্যাতা বা মুফাসসের। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেছেন, মহানবী(সঃ)-এর যাবতীয় সিদ্ধান্তই পবিত্র কোরআন থেকে উদ্ভাবিত। 'আল্লাহ্ বলেছেন انزلنا اليك الكتاب .....। হুযুর বলেন, আমাকে কোরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে তারই মত আরেকটি জিনিস অর্থাৎ সুন্নত। অতএব সুন্নতেও যখন তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না, তখন সাহাবাদের বাণীর প্রতি লক্ষ্য করতে হবে; তাঁরাই কোরআনের বিষয়ে সবচেয়ে বেশী অবগত। কারণ, তাঁরা কোরআনের অবতরণকালের সমস্ত অবস্থা ও রীতি-পদ্ধতিসমূহ স্বয়ং দেখেছেন। তদুপরি তাঁরা পরিপূর্ণ জ্ঞান-বুদ্ধি ও নেক আমলের গুণেও বিভূষিত ছিলেন।

তফসীরের এ রীতিটি সম্পূর্ণ প্রকৃতিগ্রাহ্য। আসল জিনিস হল কোরআনের শব্দাবলী এবং তার নিজের ব্যাখ্যা। তারপর মহানবী (সঃ)-এর সুন্নত। আর তৃতীয় পর্যায়ে সাহাবায়ে কেরামের বাণীসমূহ।

এতে এই সত্যটি পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, যাঁরা মহানবী (সঃ)-এর ব্যাখ্যা এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণীসমূহের আলোকে কোরআন মজীদ বুঝতে চান, তাঁরা কোরআনের শব্দমালার গুরুত্ব বাতিল করতে চান না। ওপরে আমরা যেসব মতামত ও বাণী উদ্ধৃত করেছি, তাতে তফসীরের জন্য কোরআনের শব্দাবলী এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই মূল ভিত্তি সাব্যস্ত হয়। বলা হয়েছে

www.icsbook.info

القران يفسر بعضه بعضا (কোরআনের এক অংশ অপর অংশের ব্যাখ্যাদান করে)। অবশ্য কোন বিষয় যদি কোরআন মজীদের বর্ণনাতে পরিষ্কার না হয়, তবে কি করতে হবে? যেকোন স্বাধীন চিন্তা-চেতনাসম্পন্ন লোকও এ প্রশ্নের এ উত্তরই দেবেন যে, এ ধরনের জটিলতার ক্ষেত্রে সবচাইতে উত্তম পথের সন্ধান দিতে পারে মহানবীর হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের বাণীসমূহ। যাঁর প্রতি কোরআন নাযিল হয়েছে এবং যাঁদের সংশোধন ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশে অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁরা একে যতটা উত্তমভাবে বুঝতে পারেন, ততটা অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু এই পথনির্দেশের পন্থা কি হবে? তা হবে এই যে, একটি আয়াতের ওপর তার শব্দাবলীর আলোতে পরিপূর্ণভাবে লক্ষ্য করতে হবে, কোরআন মজীদে যে সমস্ত আয়াত উল্লিখিত আয়াতের অনুরূপ, সেগুলোর আলোকেও তা ভাল করে দেখে নিতে হবে, পূর্বাপর আয়াতের সাথে তার সামঞ্জস্য এবং ব্যাকরণিক গঠন- প্রকৃতির দিক দিয়েও বিচার-বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু এই সমস্তের পরেও পুরোপরি সন্তুষ্টি না এলে বুঝতে হবে, আয়াতের শব্দাবলী আরও একটা কিছু চাইছে। কিন্তু সে বিষয়টি যদি সাধারণভাবে অনুধাবন করা না যায় তবে এক্ষেত্রে আমরা মহানবী (সঃ)-এর হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণীর শরণাপন্ন হই। আর তাতে যদি এমন কোন বিষয় পেয়ে যাই, যাতে সে আয়াতের সমস্ত জটিলতা পরিষ্কার হয়ে যায়, তারপরে আর আয়াতের শব্দগুলোর মর্ম উদ্ধারের জন্য অন্য কোন কিছুর অপেক্ষা থাকে না। ব্যাকরণিক গঠন ও অগ্রপশ্চাৎ সম্পর্কের যাবতীয় চাহিদাই পূর্ণ হয়ে থাকে, তবে সে বিষয়টি যদি যথার্থ ও বিশুদ্ধভাবে উদ্ধৃত হয়ে থাকে, তা হলে আমরা তা গ্রহণ করব। পক্ষান্তরে আয়াতের শব্দাবলী কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখুক আর নাই রাখুক, কোন কথা রেওয়ায়েতের সংগ্রহে দেখতে পেলেই খামাখাই এনে তার সাথে লাগিয়ে দেব না অথবা গঠন ও আনুপূর্বিক সংযোগ, সামঞ্জস্যপূর্ণ আয়াত, হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের বাণীর প্রকাশ্য বিরোধী হলে তা গ্রহণ করব না। এ ধরনের বাড়াবাড়ির কারণেই মানুষের মধ্যে হাদীস ও পূর্বর্তী বর্ণনাসমূহের প্রতি একটা খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে এবং এমন সব ধারণার বিস্তার ঘটেছে, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। যাঁরা অনুসন্ধান -গবেষণা করেন, কোন কালেই তাঁদের এ ধর্ম ছিল না। তাঁরা কোরআনের তফসীরের ব্যাপারে সর্বদা কোরআনকেই অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছেন।

www.icsbook.info

অবশ্য কোন বিষয় বিশ্লেষণসাপেক্ষ হলে এবং সঠিক হাদীস ও পূর্ববর্তী বর্ণনার দ্বারা তার বিশ্লেষণ হয়ে গেলে তাঁরা তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। আর এটা এমন একটা ব্যাপার যার বৈধতা সম্পর্কে কারো কোন দ্বিমত নেই।

এখন রইল, এই হাদীস অথবা 'আসার'গুলোকে একান্তভাবেই শুদ্ধ ও প্রমাণিত হতে হবে; মওজু বা জাল হলে চলবে না। বস্তুত এটাও এমন একটা বিষয়, যার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। আমাদের ওলামা সম্প্রদায় নিজেরাও বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এতকানে আছে ঃ

তফসীরের কয়েকটি উৎস রয়েছে। তন্মধ্যে চারটি মূলনীতিস্বরূপ। প্রথমত, সেসব উদ্ধৃতি, যা মহানবী (সঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই অগ্রগণ্য। কিন্তু এতে দুর্বল ও মওজু থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। কারণ, এ ধরনের রেওয়ায়েত সংখ্যা বিপুল। সে কারণেই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, তিনটি বিষয় আছে, যার কোন আমল নেই; তফসীর, মালাহেম ও মাগাজী।

একথা কেউই বলেন না যে, শুদ্ধাশুদ্ধ সব রকমের রেওয়ায়েতের ওপরই বিশ্বাস করতে হবে। বরং সবাই বলেন যে, পরিপূর্ণ যাচাইয়ের পর যেসব রেওয়ায়েতই গ্রহণযোগ্য বেরোবে এবং বর্ণনা ও ব্যবহারের সমস্ত মূলনীতিতে যাচাই করার পর যথার্থভাবে প্রমাণিত হয়ে যাবে, শুধু সেসব রেওয়ায়েতই গ্রহণ করা যেতে পারে। আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এই মত স্থির করেছি যে, শুদ্ধ রেওয়ায়েত এবং কোরআনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই; বরং কোরআন মজীদের সবচেয়ে উত্তম তফসীরই হচ্ছে শুদ্ধ রেওয়ায়েত, প্রমাণিত 'আসার' এবং মহানবী (সঃ) যা কিছু করেছেন, যা কিছু বলেছেন তার সবই কোরআন থেকে নির্গত। ওপরে প্রসঙ্গক্রমে হযরত ইমাম শাফেয়ীর একটি উদ্ধৃতি বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর (সঃ) যত বিচার-মীমাংসা করেছেন, সবই কোরআন মজীদ থেকে নেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

قال الشافعى (رح) كلما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القران ـ

এমতাবস্থায় কোরআন এবং হাদীসের মাঝে বিরোধ হবে কেমন করে? সাধারণত মানুষ হাদীসের বিরাট সংগ্রহের মধ্যে শুধু এতটুকু অংশকেই কোরআন সম্পর্কিত বলে মনে করে, যা 'তফসীর পরিচ্ছেদ' শিরোনামে সংযোজিত রয়েছে।

www.icsbook.info

আর বাকী অংশকে কোরআনের সাথে সম্পর্কহীন বলে মনে করে। পক্ষান্তরে হাদীস সম্পূর্ণভাবেই কোরআনের জ্ঞান। হাদীসের ওপর যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করা যায়, তাহলে হাদীস ও কোরআনের যে গভীরতর সম্পর্ক, তা অতি পরিষ্কারভাবে সামনে এসে যায়।

তথাপি হাদীসের মান মূলের মত নয় বরং শাখার মত। মূল হচ্ছে কোরআন মজীদ। এটি যেমন পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবসমূহের জন্য কষ্টি পাথরের মত, তেমনিভাবে পরবর্তী সমস্ত কিতাবের জন্যও। কখনও কোন রেওয়ায়েত এবং আয়াতের মধ্যে কোন রকম বিরোধ দেখা দিলে আয়াতের কোন রকম রূপক বিশ্লেষণ করা চলবে না, কিন্তু রেওয়ায়েতের ব্যাখ্যা করা চলবে। আয়াত যথাস্থানে বহাল থাকবে। কোরআন গবেষকদের রীতি সব সময়ই তাই ছিল। মন্‌সুখ বা রহিতকরণ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মত ফেকাহ্‌শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক সমস্ত কিতাবেই বর্ণিত রয়েছে। তাঁর মতে সুন্নাহ্‌ কখনই কোরআন মজীদের কোন আয়াতকে রহিত করতে পারে না। অবশ্য এ মতের বিরোধীরা এ বিষয়টি নিয়ে তাঁর প্রচুর সমালোচনা করেছেন। এমনকি 'মুসাল্লামুস্‌ সুবূত' গ্রন্থের ব্যাখ্যাতা একে অন্যায় বাড়াবাড়ি পর্যন্ত বলেছেন। কিন্তু প্রকৃত ও যথার্থ মত এটাই।

'ফেকাহ্‌শাস্ত্রের মূলনীতি' গ্রন্থে ইমাম সাহেবের যুক্তি-প্রমাণাদি উদ্ধৃত রয়েছে। এ শাস্ত্রে তাঁর নিজেরও রচনা রয়েছে। তাতেও তিনি নিজ মতামত সম্পর্কে যুক্তি-প্রমাণ উত্থাপন করেছেন। আল্লামা আমুদীও তাঁর কিতাবে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বরং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এবং অধিকাংশ আলেমের মতও তাই, যাঁরা হাদীস ও রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। কাজেই ফেকাহশাস্ত্রের ওলামা ও তর্কশাস্ত্রের পন্ডিতদের মত আলাদা হতে যাবে কেন?

যা হোক, হাদীসসমূহকে এই মর্যাদায় রেখে যদি কোরআন মজীদ বুঝতে চেষ্টা করা হয়, তা হলে তাতে কোরআন বুঝার ব্যাপারে যথেষ্ট মূল্যবান সাহায্য লাভ হবে। কোন রকম জটিলতাই সৃষ্টি হবে না। আমাদের মতে, হাদীসকে উল্লিখিত মর্যাদা থেকে বাড়িয়ে দেখা অনেকটা বাড়াবাড়ি এবং এর চাইতে নীচে নামানো দুর্ভাগ্য ও আত্মপ্রবঞ্চনার শামিল। যারা ইদানীং হাদীসসমূহকে বাদ দিয়ে কোরআন বুঝতে চান, তাঁদের তুলনা সেই যৌবনোন্মত্ত চপল যুবকের মত, যে

www.icsbook.info

কোন নৌকা-ভেলা ছাড়াই মহাসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর মনে মনে ধারণা করে, সাঁতরেই এ সাগর পাড়ি দেবে! এই দুঃসাহস বাহ্‌বার যোগ্য হতে পারে, কিন্তু প্রকারান্তরে তা আত্মহত্যারই নামান্তর, যা আল্লাহ কখনই ক্ষমা করবেন না।

শানে নুযূল ঃ

ওপরে রেওয়ায়েত ও হাদীস সম্পর্কে আমরা যে মৌলিক আলোচনা করেছি, তা রেওয়ায়েত ও কোরআন মজীদের মধ্যকার সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু বিশেষভাবে শানে নুযূল সম্পর্কে মানুষের মনে এমন কিছু কিছু প্রশ্নের উৎপত্তি হয়, যেগুলো দূরীকরণকল্পে সে মৌলিক আলোচনার পরেও বিষয়টির বিশেষ বিশেষ দিকগুলো সামনে রেখে কয়েকটি ছত্র লেখে দেয়া প্রয়োজন।

তফসীরের কিতাবসমূহের স্পষ্ট পর্যালোচনা করতে গিয়ে সাধারণত একটা জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় যে, প্রায় সব আয়াতের নীচেই শানে নুযূল হিসাবে একটা না একটা ঘটনা বিবৃত থাকে। বরং কোন কোন সময় একই আয়াতের শানে নুযূল হিসেবে একাধিক ঘটনাও বর্ণনা করা হয়। পক্ষান্তরে, অনেক সময় সেসব ঘটনার মধ্যে বিরোধ, এমনকি বৈপরীত্যও দেখা যায়। আর সাধারণত এসব ঘটনা এমন বিস্ময়কর এবং আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্কের ক্ষেত্রে এতই বৈসাদৃশ্যপূর্ণ, যা মানতে মন সংকোচ বোধ করে। এ ধরনের রেওয়ায়েত বা উদ্ধৃতি সম্পর্কে মানুষের মনে দু'রকমের সংশয় রয়েছে। প্রথমত এসব ঘটনার অধিকাংশই এমন, যার সাথে মূলত আয়াতের কোন সম্পর্কই নেই। দ্বিতীয়ত যদি প্রতিটি আয়াত সম্পর্কেই এক বা একাধিক ঘটনাকে শানে নুযূল মেনে নেয়া হয়, তা হলে কোরআন মজীদে নিয়ম-শৃঙ্খলা বা ক্রমবিন্যাসের অন্বেষণ অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, শৃঙ্খলার দাবী হল ধারাবাহিকতা। অথচ প্রত্যেকটি আয়াতেরই কোন বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পর্ক থাকাটা এই ধারাবাহিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ সন্দেহটি সূরা আন'আম-এর তফসীর করতে গিয়ে হযরত ইমাম রাযী (রঃ)-এর মনেও উদয় হয়েছিল এবং তিনি তার কোন সন্তোষজনক উত্তর না দিয়েই এগিয়ে গিয়েছেন। সুতরাং - واذا جاءك الذين يؤمنون بايتنا আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে তিনি লেখেছেন ঃ

এখানে আমার সামনে একটা জটিল প্রশ্ন রয়েছে। তা হল, সবই এ ব্যাপারে একমত যে, পূর্ণ এই সূরাটিই একবারে নাযিল হয়েছে। ঘটনা যদি তাই হয়,

www.icsbook.info

তবে সূরাটির প্রত্যেকটি আয়াত সম্পর্কে একথা বলা কেমন করে সম্ভব হতে পারে যে, এটি অমুক ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে?

প্রথম প্রশ্নটির সমাধানকল্পে পূর্বোক্ত কোন কোন আলোচনাই যথেষ্ট। অর্থাৎ, তফসীরের প্রকৃত মূলনীতি হচ্ছে, রেওয়ায়েতের আগে মূল আয়াতের শব্দাবলী এবং আনুপূর্বিক বিন্যাস ও ধারাবাহিকতার বিষয় চিন্তা করা। শব্দগুলো যদি তার উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করে দেয়, আয়াতের যথার্থ বিশ্লেষণ যদি বাইরের কোন সাহায্য ছাড়াই পরিষ্কার হয়ে যায়, বিন্যাস যদি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের যাবতীয় শর্ত মোতাবেক হয়ে থাকে, তা হলে এমন কোন ঘটনা আয়াতের সাথে খাটিয়ে দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই, যা তার বিন্যাস ও ধারাবাহিকতা বিধ্বস্ত করে দেয় এবং সুব্যাখ্যাকে আহত করে। অবশ্য শানে নুযূল যদি আয়াতের পরিচ্ছন্ন ও যথার্থ বিশ্লেষণের সমর্থন যোগায়, তা হলে তা অতিরিক্ত আত্মতুষ্টি ও প্রশান্তির কারণ হতে পারে। এ বিষয়টি উপেক্ষা করার কোন কারণও নেই। বিষয়টি উদাহরণের মাধ্যমে এভাবে উপলব্ধি করা বাঞ্ছনীয় যে, একজন চিকিৎসক যেমন একটা ব্যবস্থাপত্র দেখে তার অংশগুলো এবং সেগুলোর পারস্পরিক গঠনবিন্যাস লক্ষ্য করেই বুঝে নিতে পারেন, তা কোন্ রোগের জন্য লেখা হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে কোরআন মজীদের একজন শিক্ষার্থীকেও আয়াতের উদ্দেশ্যসমূহ, তার অংশসমূহ এবং সেগুলোর পারস্পরিক বিন্যাস লক্ষ্য করে সূরার শানে নুযূল স্বয়ং সূরার ভেতর থেকেই বের করে নেয়া কর্তব্য। অতপর অতিরিক্ত সন্তুষ্টি ও পরিতৃপ্তির লক্ষ্যে সেসব ঘটনাপঞ্জির প্রতি লক্ষ্য করা উচিত, যা শানে নুযূল হিসেবে আয়াতের প্রসংগে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে দুর্বল ও অসমর্থিত রেওয়ায়েতের দ্বারা বিভ্রান্তির আশঙ্কা নেই। তখন কোরআনের আলোই সঠিক পথের দিশা দেবে। যেসব রেওয়ায়েত সঠিক, সেগুলোতে কোন সংশয় সৃষ্টি না হয়ে বরং পরিতুষ্টি ও প্রশান্তি লাভ হবে। পক্ষান্তরে যেসব রেওয়ায়েত সঠিক নয়, সেগুলো আপনা থেকেই সরে যাবে।

ওপরে হযরত ইমাম রাযী (রঃ)-এর যে সন্দেহটির উল্লেখ করা হয়েছে, তাও তেমন একটা জোরালো নয়। গবেষকদের যেসব উত্তর তফসীরের মূলনীতি বিষয়ক গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, তাতেই তার সমাধান হয়ে যায়। অতএব, আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এ ধরনের সন্দেহের উত্তরে লেখেছেন ঃ

জারাক্শী (রঃ) তাঁর 'বোরহান' নামক গ্রন্থে লেখেছেন, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের একটা সাধারণ রীতি ছিল যে, যখনই তাঁদের মধ্যে কেউ

www.icsbook.info

বলতেন, "এ আয়াতটি অমুক বিষয়ে নাযিল হয়েছে", তখন তার অর্থ এই হত যে, এ আয়াতে অমুক বিষয়ের নির্দেশও রয়েছে। এর এই অর্থ হত না যে, হুবহু অমুক ঘটনাই আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ। সে আয়াতের দ্বারা যেন বিষয়টির যথার্থতা প্রমাণ করা হয়েছে। ঘটনার উদ্ধৃতি নয়।

এ প্রসঙ্গে হযরত শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী (রঃ)-এর গবেষণাও তাই। তিনি 'ফওযুল কবীর' গ্রন্থে লেখেছেন ঃ

সাহাবী ও তাবেয়ীগণের বর্ণনা সংগ্রহ থেকে যা বুঝা যায়, তা হচ্ছে–

نزلت فى كذا অর্থাৎ এ আয়াত অমুক ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হয়েছে মন্তব্য শুধুমাত্র হুযুরে আকরাম (সঃ)-এর সময়ে সংশ্লিষ্ট আয়াতটির বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনাবলীর ব্যাপারে ব্যবহৃত হত। ما صدق عليه اية বলে যেসব ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোই হচ্ছে ঐ সমস্ত ঘটনাবলী সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মহানবী (সঃ) যেগুলোর উল্লেখ করেছেন। সুতরাং সেসব ঘটনার সাথেই এ আয়াতকে সংশ্লিষ্ট মনে করা ঠিক হবে না। শানে নুযূল সম্পর্কিত বর্ণনাগুলোর দ্বারা এ কথা কখনও বুঝা যায় না যে, এ আয়াত বা সূরা শানে নুযূলে বর্ণিত ঘটনা বা ব্যক্তি সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। বরং পারিপার্শ্বিক যেসব অবস্থা সংশোধনার্থ সংশ্লিষ্ট আয়াত বা সূরায় জোর দেয়া হয়েছে, ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সেসব ঘটনাই শানে নুযূল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব, সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ মত হল, শানে নুযূল সংক্রান্ত বর্ণনাগুলোকে আয়াত বা সূরার মর্ম উদ্ধারের সহায়ক হিসেবে গণ্য করা। কেননা, কোরআনের প্রত্যেকটি নিদর্শন ও বক্তব্যই সর্বজনীন আবেদনে সমৃদ্ধ। দেশ-কাল ও পাত্রের গণ্ডি পেরিয়ে সমগ্র মানব জাতির জন্য যেহেতু কোরআনের আবেদন, সেহেতু বিশেষ বিশেষ ঘটনাকেন্দ্রিক তফসীর বা ব্যাখ্যা কোন অবস্থাতেই সংগত হবে না। (সংক্ষেপিত)

এতে وانزلت বা فنزلت অথবা فانزل الله قوله نزلت فى كذا প্রভৃতি পরিভাষার মর্ম সাহাবা ও তাবেয়ী (রঃ)-গণের দৃষ্টিতে কি ছিল এবং শানে নুযূল সম্পর্কে তফসীরের কিতাবগুলোতে যেসব রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর অবস্থাই বা কি তা বুঝা যাচ্ছে। বুঝা যাচ্ছে সেগুলোর মর্যাদা কি, উদ্ভাবন, প্রমাণ উপস্থাপক আর আনুপূর্বিক সম্পর্ক স্থাপনের, নাকি উদ্ধৃতি কিংবা নকলের। প্রশ্নও এখান থেকেই ওঠেছিল। মানুষ বুঝে নিয়েছিল যে, যে আয়াত

www.icsbook.info

সম্পর্কে বলা হয়, نزلت فى كذا (অমুক বিষয়ে অবতীর্ণ) তখন তাতে তাঁদের উদ্দেশ্য থাকে, হুবহু এ ঘটনাটিই এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ। কিন্তু ওপরে আল্লামা জারাক্‌শী এবং হযরত শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী (রঃ)-এর যে মতামত উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাতে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয়ে গেছে যে, نزلت فى كذا কিংবা فانزل الله تعالى প্রভৃতি পরিভাষার উদ্দেশ্য তা নয়, যা সাধারণত লোকেরা বুঝে, বরং এটা প্রমাণ উপস্থাপন ও উদ্ভাবন পর্যায়ের একটা বিষয়। অর্থাৎ, এসব পরিভাষার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ আয়াত দ্বারা অমুক বিষয়টি উদ্ভাবিত হয় কিংবা অমুক বিষয়টি প্রমাণ করে। এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জেনে নেয়ার পরে সমস্ত প্রশ্ন ও সন্দেহ আপনা থেকেই শেষ হয়ে যায়।

তফসীর এবং শানে নুযূলের কিতাবসমূহে কোন কোন সময় একই আয়াতের নাযিল হওয়ার কারণ হিসেবে এমন কোন ঘটনা বর্ণনা করা হয়, যার সংঘটনকাল ও আয়াতের অবতরণকাল কোনক্রমেই এক হতে পারে না। আবার অনেক সময় সূরাটি দেখা যায় মদীনায় অবতীর্ণ আর যে ঘটনাটি বর্ণিত হয়ে থাকে, তা হচ্ছে মক্কার জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। তেমনিভাবে কখনও আয়াত হয় মক্কী আর সম্পৃক্ত ঘটনা হয় মদীনার। বরং কোন কোন শানে নুযূল এমনও দেখা যায়, যেগুলোর সংঘটনকাল এবং সে সম্পর্কিত আয়াতটির অবতরণকালের মধ্যে বহু কালের ব্যবধান রয়ে গেছে। এমতাবস্থায় শিক্ষার্থী যদি এ কথা না জানে যে, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীন (রঃ)-এর দৃষ্টিতে শানে নুযূলের প্রকৃত অর্থটা কি, তা হলে পড়তে গিয়ে তাকে প্রচুর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। বরং তাকে সন্দেহ-সংশয়ের কিংবা অস্বীকৃতির এমন সব অবস্থার সাথে সংগ্রাম করতে হয়, যার বর্ণনা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

এতদসত্ত্বেও আমরা একথা অস্বীকার করি না যে, শানে নুযূলের ব্যাপারে মানুষ প্রচুর বাড়াবাড়ি করেছে। হয়ত বা এমন কোন আয়াত খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার নীচে কোন একটা কাহিনী উদ্ধৃত করে দেয়া হয়নি এবং হয়ত সাধারণত সেসব কাহিনী এমন ভিত্তিহীন যা হাদীসবেত্তা মনীষীদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কোরআন শিক্ষার্থীদেরকে এসব কাহিনীতে জড়ানো উচিত নয়। বরং এটা কোরআন শিক্ষার পক্ষে অনেক সময় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে যেসব শিক্ষার্থী কোরআনের বিন্যাস বিষয়ে অন্বেষণ করেন (বস্তুত যা কোরআন বুঝার প্রকৃত পথ), তাদের জন্য এসব গল্প-কাহিনীর চাইতে বেশী বাধা দ্বিতীয় একটি

www.icsbook.info

নেই। হযরত ইমাম রাযীর মনে যে প্রশ্ন উদয় হয়েছিল এবং যা আমরা বর্ণনা করেছি, তাও এ ধরনের অলীক কাহিনীরই ফসল। এমন ধরনের গল্প-কাহিনীসহ কোন শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রকৃত তথ্যের সন্ধান করা সম্ভব নয়।

এ উপলব্ধিটি শুধু আমাদেরই নয়, বরং হযরত শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী (রঃ)-এরও ছিল। তিনি বলেছেন ঃ

এটা জানবার বিষয় যে, শানে নুযূলের বিরাট অংশেরই কোরআন বুঝার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এর কার্যকরী অংশ অতি অল্প। আর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক কালবী যে বাড়াবাড়ি করেছেন এবং প্রতি আয়াতের নীচেই একটা না একটা কাহিনী উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, তার বড় অংশই মুহাদ্দেসীনের দৃষ্টিতে সঠিক নয় এবং সেগুলোর সনদও গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই একে তফসীরের শর্ত মনে করা একান্তই ভুল। আল্লাহ্‌র কালামের গবেষণা-পর্যালোচনা এর ওপর নির্ভরশীল সাব্যস্ত করাটা নিজেই নিজেকে আল্লাহ্‌র কালাম থেকে বঞ্চিত করার শামিল।

সুতরাং কাহিনী ও ঘটনাসমূহের ব্যাপারে সঠিক মত হচ্ছে ওই কাহিনীগুলো জানার জন্য চেষ্টা করতে হবে, যেগুলোর প্রতি কোরআনের আয়াতসমূহে ইঙ্গিত করা হচ্ছে এবং যেগুলো জানা আয়াতগুলো পরিপূর্ণভাবে বুঝার জন্য প্রয়োজন।

হযরত শাহ ওলীউল্লাহ (রঃ) বলেন ঃ

তফসীরকারদের পক্ষে কাহিনীসমূহের মধ্যে দু'রকমের কাহিনী জানা আবশ্যক। প্রথমত সেসব কিস্‌সা বা কাহিনী, যেগুলোর প্রতি কোরআনের আয়াতসমূহে ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে। এ ধরনের আয়াতের ইঙ্গিতগুলো বুঝতে পারা কিসসাগুলো জানা ছাড়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত সেসব কাহিনী, যাতে কোন সাধারণ বিষয়কে বিশিষ্টতা দেয়া হয় অথবা এমনি ধরনের অন্য কোন বিষয়, যা প্রকাশ্য অর্থ থেকে সরিয়ে অপর কোন তাৎপর্যের প্রতি নিয়ে যাওয়ার মত। নিঃসন্দেহে এমন ধরনের আয়াতসমূহ সেসব কিসসা-কাহিনীর সাহায্য ছাড়া বুঝা যেতে পারে না।

এখানে উপরোল্লিখিত প্রকারের যেসব কিস্‌সার প্রতি কোরআনের আয়াতে ইঙ্গিত করা হচ্ছে তার কতিপয় উদাহরণ উল্লেখ করছি। এর একটি চমৎকার উদাহরণ সূরা সুজাদালায় রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

www.icsbook.info

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ۔ (مجادله - ١)

আল্লাহ তাআলা সে মহিলার কথা শুনে নিয়েছেন, যে তোমার সাথে তার স্বামীর ব্যাপারে ঝগড়া করছিল এবং আল্লাহ্‌র কাছে অভিযোগ করছিল। আর আল্লাহ্ তোমাদের দু'জনের কথাবার্তাই শুনছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী ও দর্শনকারী।

উল্লিখিত আয়াতে সে মহিলার যে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা যদি সবিস্তারে জেনে নেয়া যায়, তা হলে এ আয়াতটি বুঝতে গিয়ে যথেষ্ট সাহায্য হতে পারে।

এমনিভাবে সূরা আহ্‌যাবের নিম্নলিখিত আয়াতে হযরত যায়েদ এবং হযরত যয়নব (রাঃ)-এর ঘটনার প্রতি সাধারণভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারলে বিষয়টিও যথেষ্ট পরিমাণে পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে।

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۔ (الاحزاب -٣٧)

আর যখন তোমরা বলছিলে, সে লোকের সাথে যার প্রতি আল্লাহ্ রহমত করেছেন যে, নিজের স্ত্রীকে আটকে রাখ এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আর তোমরা নিজেদের মনে এমন বিষয় গোপন করে রাখতে যা আল্লাহ্ প্রকাশ করতেন। বস্তুত আল্লাহ্‌ই তার বেশী অধিকারী যে, তাকে ভয় করা হবে। অতএব যায়েদ যখন তার (স্ত্রী) সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে আমি তাকে তোমার সাথে বিয়ে দিয়েছি, যাতে মুমিনদের নিকট বানানো পুত্রদের স্ত্রীদের সম্পর্কে কোন সংশয় থাকতে না পারে, যখন তারা তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে নেয়।

এমনিভাবে সূরা তাহরীমের নিম্নলিখিত আয়াতগুলোতেও কোন কোন ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতগুলো বুঝার জন্য তা জানা থাকা প্রয়োজন। বলা হয়েছে ঃ

www.icsbook.info

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِىُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْبَاَكَ هٰذَا قَالَ نَبَّاَنِىَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ـ (تحريم - ٣)

আর মহানবী (সঃ) যখন নিজের বিবিদের মধ্যে কারও সাথে একটি কথা গোপনে বললেন, অতপর যখন সে সে বিষয়ে সংবাদ দিয়ে দিল এবং আল্লাহ নবীর নিকট কথাটি প্রকাশ করে দেন, তখন নবীও তার কিছু প্রকাশ করলেন এবং কিছু গোপন রাখলেন। অতপর যখন তা স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করলেন, তখন তিনি বললেন, কে বলে দিয়েছে? বললেন, আমাকে আল্লাহ্ বলেছেন, যিনি জ্ঞানী ও পরিজ্ঞাত।

এই আয়াতটি এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াত ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিকভাবে বুঝে আসতে পারে না, যতক্ষণ না সেসব বিষয় জেনে নেয়া যায়, যেগুলোর প্রতি তাতে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। কাজেই এসব ক্ষেত্রে শানে নুযূলের অন্বেষণ নিঃসন্দেহে প্রয়োজন। কিন্তু এমন ক্ষেত্র কোরআন মজীদে অনেক বেশী নেই; মাত্র কয়েকটি এবং সঠিক ও প্রামাণ্য হাদীসে সাধারণত সেগুলোর বিস্তারিত বিশ্লেষণও রয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, প্রথমে কোরআন মজীদের আয়াতটিতেই মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করতে হবে। তাতেই ঘটনার সমস্ত দিক পরিষ্কারভাবে সামনে এসে যাবে। কিন্তু কোন একটি দিক যদি প্রচ্ছন্ন থেকে যায়, পরিষ্কার করে বুঝে না আসে এবং আয়াতের শব্দসমূহ তাকেই খুঁজে বেড়াতে থাকে, তা হলে অতিরিক্ত পরিতৃপ্তির উদ্দেশে সঠিক ও যথার্থ পন্থায় সম্পৃক্ত ঘটনা জেনে নেয়া উচিত। অবশ্য তখনও খেয়াল রাখতে হবে, তা যেন কোরআনের ইঙ্গিতের সাথে পরিপূর্ণ ভাবে সুসমঞ্জস হয়; তার বিরোধী কিংবা বিপরীত যেন না হয়।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ ঃ

পেছনের পাতাগুলোতে যেসব অর্থ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে, এক্ষণে সংক্ষেপে আমরা সেগুলোর একটা সারসংক্ষেপ তুলে ধরতে চেষ্টা করব, যাতে করে প্রকৃত বিষয়টি পরিষ্কারভাবে সামনে এসে যেতে পারে।

১. কোরআন মজীদ সে শ্রেণীর কালামের অন্তর্ভুক্ত, যা কোন কোন দিক দিয়ে একান্ত সহজ ও সরল এবং কোন কোন দিক দিয়ে অতি সূক্ষ্ম ও জটিল। সেজন্যই

www.icsbook.info

কোরআন একটি স্থূলগ্রন্থ, যা বুঝবার জন্যে কোন চেষ্টা-চরিত্রের কিংবা কোন গভীর চিন্তা-ভাবনার অথবা গভীর অধ্যয়নের প্রয়োজন নেই বলে ধারণা করে নেয়া নিতান্ত ভুল। সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে কোরআন সম্পূর্ণ স্পষ্ট; প্রথম দৃষ্টিতেই হারাম হালাল বা বৈধ-অবৈধের সমস্ত সীমানা নির্ধারণ করে দেয় এবং ভাল-মন্দ ও স ৎ-অসৎ চিনে নেয়ার জন্য যাবতীয় নিদর্শন ও চিহ্নসমূহ প্রকাশ করে। কিন্তু একই সঙ্গে এতে এমন একটি সূগভীর দর্শন এবং অভিজ্ঞান বা হেকমতও বিদ্যমান, যা অর্জন করতে হলে হালকাভাবে অধ্যয়ন করাই যথেষ্ট নয়, বরং যথেষ্ট মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা-গবেষণা করা প্রয়োজন।

২. কোরআন মজীদ সম্পর্কে এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, এটি শুধুমাত্র আইন-কানুন ও সংবিধান সম্বন্ধীয় একটি সংকলন এবং বিধি-নিষেধ কিংবা হারাম-হালাল জানার একটা শুষ্ক ও সহজ-সরল নিয়ম-পদ্ধতি। কোরআনের গঠন স্বয়ং তার বিশ্লেষণ অনুযায়ী তিনটি অংশের দ্বারা হয়েছে। (১) আল্লাহ্‌র আয়াত অর্থাৎ, দলিল-প্রমাণাদি, (২) কিতাব অর্থাৎ, আইন-কানুন ও সংবিধান (৩) হেকমত অর্থাৎ শরীয়তের মূলতত্ত্ব এবং ধর্মের নির্যাস। প্রথম অংশটি ধর্মের যুক্তি, দ্বিতীয়টি ধর্মের ব্যবস্থা আর তৃতীয়টি হচ্ছে ধর্মের দর্শন। কাজেই কোরআন মজীদ একটি চিন্তা-গবেষণার বস্তু। এ জন্যেই সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তার একেকটি সূরার গবেষণায় আট-আটটি বছর কাটিয়ে দিতেন। তাঁরা তার জটিলতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার উদ্দেশে মজলিস গঠন করতেন। মহানবী (সঃ)-এর কাছে তার জটিলতা নিরসনের জন্যে সাহায্য চাইতেন। বুদ্ধি-বৃত্তির প্রশান্তি, অন্তরাত্মার পবিত্রতা এবং পার্থিব জীবনে জীবিকা অর্জন ও রাজনীতির জন্যে একে সম্পূর্ণভাবে যথেষ্ট বিবেচনা করতেন। আর বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের উক্তি, "আল্লাহর কিতাব আমাদের জন্য যথেষ্ট"–এর অর্থও ছিল তাই যে, আমাদের দ্বীন ও দুনিয়া বা ইহলোক ও পরলোক এবং জ্ঞান ও আত্মার যা কিছু চাহিদা, কোরআন সে সমস্তই নিজের মধ্যে সংরক্ষণ করে। এমন নয় যে, তাতে শরীরের জন্য সব কিছু আছে কিন্তু আত্মার প্রশান্তির কোন ব্যবস্থা নেই কিংবা হালাল-হারাম তথা বৈধ-অবৈধের নিয়ম-কানুন তো আমাদের সামনে তুলে ধরেছে, যা আমাদের জীবিকার অন্বেষণে যথেষ্ট কাজে লাগতে পারে, কিন্তু আমাদের জ্ঞান ও চেতনার ব্যাকুলতা আর মন-মস্তিষ্কের জটিলতাসমূহকে এমনি ছেড়ে দিয়েছে। সেগুলোর সমাধানের জন্য আমাদেরকে গ্রীক দার্শনিক

www.icsbook.info

তার্কিকদের যথেচ্ছ বক্তব্য আর সমকালীন গবেষণাবিদদের গবেষণার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে, তাও নয়।

৩. কোরআন মজীদে এমন একটি আয়াতও নেই, যাতে বুঝা যায় যে, এটি তো একটি স্থূল গ্রন্থ। বরং তার বিপরীতে এতে অসংখ্য আয়াত রয়েছে, যার প্রতিটি ভাষ্য সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা প্রয়োজন। চিন্তা-গবেষণা ছাড়া তার শিক্ষার তাৎপর্য বুঝে আসতে পারে না। যারা কোরআন মজীদকে কোন গভীর তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ বলে মনে করেন না এবং

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

আয়াতটি দ্বারা নিজের সে ধারণার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন, তাদের সে যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল ও ভ্রান্ত। উল্লিখিত আয়াতের মর্ম তা নয়, যা সাধারণভাবে মনে করা হয়। এর মর্ম হচ্ছে, কোরআন মজীদকে আল্লাহ্ তাআলা জ্ঞানার্জন ও শিক্ষালাভের জন্য সম্পূর্ণভাবে পর্যাপ্ত এবং অত্যন্ত উপযোগী করে তৈরী করেছেন। এই উদ্দেশে তা সর্বদিক দিয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এতে কোন রকম কমতি নেই; কোন কিছুরই অভাব নেই। يسرنا শব্দটি শুধু তার সহজতাকেই প্রকাশ করে না; বরং প্রকৃতপক্ষে তার পরাকাষ্ঠা, তার সামগ্রিকতা এবং তার উপযোগিতাও প্রমাণ করে। আর তাতেই তার সহজবোধ্যতা প্রকাশ পায়। কারণ, যাকে কোন একটি উদ্দেশের জন্য পরিপূর্ণভাবে সাবলীলও করে নেয়া হয়েছে, তা সে উদ্দেশে নিঃসন্দেহে সহজ-সরলও অবশ্যই হবে।

৪. যাঁরা কোরআনের তফসীরের ব্যাপারে শুধুমাত্র রেওয়ায়েতের ওপরেই নির্ভর করেন, তাঁরা নিশ্চিতই বাড়াবাড়ি করেন। অথচ তা বিশেষজ্ঞ মত ও অনুসৃত নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। কোরআন মজীদের তফসীরের ব্যাপারে মূল ভিত্তি হচ্ছে স্বয়ং তারই শব্দ, তারই যুক্তি-প্রমাণ, তারই উপমা-উদাহরণ, তার আনুপূর্বিক যোগসূত্র এবং তারই বিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা। প্রত্যেকটি আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়েই এসব বিষয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কোন অবস্থাতেই এগুলোকে উপেক্ষা করা যাবে না। কিন্তু এ কথাও অনস্বীকার্য যে, রেওয়ায়েত ও হাদীসের সাহায্য ছাড়া কোরআনের তফসীরের জটিলতার সমাধান হতে পারে না। কোরআন মজীদ যে যুগে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যেসব লোককে প্রাথমিক পর্যায়ে তাতে সম্বোধন করা হয়েছিল, স্বাভাবিকভাবেই সে যুগের অসংখ্য বৈশিষ্ট্য এবং সে জাতির সীমাহীন সমস্যার প্রতি তা ইঙ্গিত

www.icsbook.info

করেছে, যাকে পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরার জন্য আমরা তাদের সাহায্য গ্রহণ থেকে মুক্ত হতে পারি না, যাঁরা কোরআনের প্রাথমিক লক্ষ্য। সে লোকদের সাহায্যে উপকৃত হওয়া কোরআনের শব্দাবলীর প্রাধান্যকে খর্ব করা নয়। আর তাতে তার অকাট্যতায়ও সামান্যতম ব্যতিক্রম ঘটে না। কারণ, রেওয়ায়েত ও হাদীসের সাহায্য তখনই গ্রহণ করা হয়, যখন কোরআনের শব্দাবলীও তার সাহায্য গ্রহণের প্রতি ইঙ্গিত করে।

এ দাবী স্বস্থানে যথার্থ যে, কোরআন মজীদ নিজের বোধগম্যতার জন্যে অন্য কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নয়। কিন্তু কোরআনের তফসীর বা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রেওয়ায়েত ও হাদীসের সাহায্য নেয়া কোরআনের মুখাপেক্ষিতার প্রমাণ নয়। বরং এতে আমাদেরই মুখাপেক্ষিতা প্রমাণ করে। আর আমাদের মুখাপেক্ষিতা এবং কোরআনের মুখাপেক্ষিতায় বিরাট পার্থক্য। আমরা কোরআন বুঝার জন্য ভাষা, ব্যাকরণ প্রভৃতির সাহায্য নেই, কিন্তু তাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, কোরআন নিজের বোধগম্যতার জন্য সেসব বিষয়ের মুখাপেক্ষী। কাজেই এতে কোরআন মজীদের পরিপূর্ণতায় কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না।

৫.শানে নুযূল দ্বারাও কোরআনের অকাট্যতায় কোন ব্যাঘাত ঘটে না। শানে নুযূলের তেমন কোন গুরুত্ব নেই যা সাধারণত মনে করা হয়। প্রামাণিকদের নিকট শানে নুযূল হচ্ছে আবিষ্কারধর্মী বিষয়। অর্থাৎ, "আয়াতটি অমুক ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে কিংবা অমুক বিষয়ে নাযিল হয়েছে" বলে সাহাবায়ের কেরামের যে উক্তি, তার অর্থ এই নয় যে, সে আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ হুবহু সে ঘটনাটিই। বরং তার অর্থ সাধারণত এই হয় যে, সে আয়াতটি অমুক নির্দেশ সম্বলিত। অতএব, বিষয়টির তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর এ পথের যাবতীয় প্রশ্নের সমাধান আপনা থেকেই হয়ে যায় এবং অতপর সেগুলোর দ্বারাও কোরআনের তফসীরের সেক্ষেত্রেই সাহায্য নেয়া উচিত যেখানে কোরআনের শব্দাবলীও তাই চায় এবং যেখানে কোন জটিলতার সমাধান হয়। বস্তুত এমন জায়গা হযরত শাহ ওলীউল্লাহ (রঃ)-এর ভাষায় গোটা কোরআনে খুব বেশী নেই।

www.icsbook.info

তফসীরের মূলনীতি

بسم الله الرحمن الرحيم

তফসীরের মূলনীতি বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমি প্রথমে সংক্ষেপে সেসব নিয়ম-পদ্ধতিরই বিশ্লেষণ করব, যা মহানবী (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর পবিত্র যুগের পরে আমাদের বিভিন্ন মতাদর্শী তফসীরকার মনীষীবৃন্দ তফসীরের ক্ষেত্রে অবলম্বন করেছেন। তারপর সংক্ষেপে সেসব নিয়ম-পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করব। অতপর উপস্থাপন করব তফসীরের সেসব মূলনীতি, যা আমার মতে সঠিক, যার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আমার মন সত্যায়ন করে এবং আমার জ্ঞানানুসারে সাহাবায়ে কেরামের আমলে যাঁরা ব্যাখ্যা করতেন তাঁরাও সর্বদা সেগুলোপ্রতি লক্ষ্য রাখতেন। আলোচনার এই ধারায় এই সূত্রটি একদিকে আপনাদের সামনে সে সমস্ত নিয়ম-পদ্ধতিগুলো তুলে ধরবে যা সাহাবাদের পরবর্তী যুগে আমাদের মুফাসসেরীন ও ব্যাখ্যাতাগণ গ্রহণ করেছেন এবং অপর দিকে সে সমস্ত উপকরণও সামনে একত্রিত হয়ে যাবে, যা বিভিন্ন মতাদর্শী তফসীরকারদের নিয়ম-পদ্ধতিসমূহের মধ্যে তুলনা করার পক্ষে এবং সেগুলোর সুষ্ঠুতা ও অসুষ্ঠুতার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আমাদের ইতিহাসে বিভিন্ন ভাষায় তফসীর সম্পর্কিত যেসব গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে, সে সবগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে যদি সেগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সামনে রেখে প্রত্যেকটিকে পৃথক করে নেয়া যায়, তা হলে আমাদের সামনে চারটি বড় রকমের মতাদর্শ আপন আপন বিশেষ মূলনীতিসহ প্রকাশিত হয়ে ওঠবে। এখানে আমি সংক্ষেপে সেই চারটি মতাদর্শ এবং তাদের তফসীর পদ্ধতিগুলোর সাথে পাঠকদের পরিচয় করাব।

মুহাদ্দেসীন ও রেওয়ায়েতাশ্রয়ীদের তফসীর পদ্ধতি ঃ

আমাদের তফসীরকারদের মধ্যে সর্বাধিক বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য দল হল মুহাদ্দেসীনও রেওয়ায়েতাশ্রয়ীদের। এ দলের তফসীর পদ্ধতি হচ্ছে, তফসীরের ক্ষেত্রে সত্যিকারভাবে মহানবী (সঃ)-এর বাণী, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর

www.icsbook.info

বিবৃতি এবং তৎপরবর্তী মুফাস্‌সেরীনের বাণীর ওপর নির্ভর করা। অতএব, তাঁদের সবচেয়ে বড় প্রচেষ্টা ছিল প্রত্যেকটি আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী বিশ্লেষক ও ব্যাখ্যাতাদের যত মত সংগৃহীত হয়েছে তার সবই জমা করে দেয়া। পক্ষান্তরে, সেসব মতামত অনেক সময় পারস্পরিক সম্পূর্ণ বিরোধীও হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাতে কোন রকম সামঞ্জস্য বিধানেরও চেষ্টা করা হয়নি। এই নীতিতে সবচেয়ে বড় যে তফসীর প্রণীত হয়েছে এবং আজও বর্তমান, তা হল ইবনে জারীর (রঃ)-এর বিখ্যাত তফসীর। এতে তফসীর সংক্রান্ত সমস্ত রেওয়ায়েত এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মনীষীবৃন্দের যাবতীয় মতামতের এক বিরাট ভাণ্ডার বর্তমান। পাঠক এতে প্রতিটি আয়াতের প্রেক্ষিতে একাধিক মতামত পেতে পারন। কিন্তু এই পার্থক্য করা সম্ভব হবে না যে, সেগুলোর কোন্‌টি সঠিক আর কোন্‌টি সঠিক নয়। রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে যেসব তফসীর এ পর্যন্ত লেখা হয়েছে সেগুলোর অধিকাংশের উৎসই হচ্ছে উল্লিখিত তফসীরখানি। প্রদীপ থেকে যেমন করে প্রদীপ জ্বালিয়ে নেয়া হয়, তেমনি করে এ গ্রন্থেরই আংশিক বর্জন ও সংক্ষেপায়নে বহু গ্রন্থ তৈরী হয়ে গেছে। ইবনে কাসীর (রঃ)-এর বিখ্যাত তফসীরখানিও সে তফসীর থেকেই সংগৃহীত।

দার্শনিকদের পদ্ধতি ঃ

মুসলমানদের সম্পর্ক যখন অনারবদের সাথে গড়ে ওঠে এবং তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের সাথে যখন তাদের পরিচয় ঘটে, তখনই ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করার সে দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ঘটে, যাকে আমরা ইলমে কালাম বা দর্শনশাস্ত্র বলে অভিহিত করি। এই দর্শনশাস্ত্রও আমাদের মধ্যে বহু মতাদর্শের জন্ম দিয়েছে এবং সেসব মতাদর্শের অনুসারীরা নিজেদের বিশেষ মত ও দৃষ্টিভঙ্গিকে মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশে কোরআন মজীদের তফসীর প্রণয়ন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এসব তফসীরের উদ্দেশ্য কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেয়ে বেশী ছিল সে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে দলিল-প্রমাণ সংগ্রহ করা, যা এসব তফসীরের প্রণেতাগণ নিজেদের দার্শনিক চিন্তাধারার মাধ্যমে সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন। এই পদ্ধতিতে যেসব তফসীর প্রণীত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সবচাইতে বিখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ তফসীর হচ্ছে দুটি। একটি আল্লামা যামাখ্‌শরী (রঃ) প্রণীত 'তফসীরে কাশশাফ' এবং অপরটি ইমাম রাযী (রঃ) প্রণীত

www.icsbook.info

'তফসীরে কবীর'। এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমোক্তটি মু'তাযেলা মতাদর্শের মুখপত্র আর দ্বিতীয়টিতে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আশায়েরা মতাদর্শের ওকালতি করা হয়েছে। রেওয়ায়েতভিত্তিক তফসীরের ক্ষেত্রে ইবনে জারীর (রঃ)-এর তফসীরের যে মর্যাদা, দার্শনিক পদ্ধতিতে প্রণীত তফসীরসমূহের মধ্যেও ইমাম রাযী ও আল্লামা যামাখশারীর তফসীরের মর্যাদা তেমনি। আর পরবর্তীকালে যাঁরা এই পদ্ধতিতে তফসীর প্রণয়ন করেছেন, তাঁরা প্রধানত এ দুটির চর্বিতই চর্বণ করেছেন মাত্র।

মুকাল্লেদ বা অনুসরণবাদীদের পদ্ধতি ঃ

মুকাল্লেদ বা অনুসরণবাদী বলতে আমাদের উদ্দশ্য ফেকাহ্‌শাস্ত্রের ইমাম মহোদয় কিংবা ফেকাহ্‌র কিতাবের অনুসরণ নয়, বরং মুফাস্‌সেরীনের গ্রন্থের অনুসরণ। ইবনে জারীর (রঃ), ইমাম রাযী (রঃ) এবং আল্লামা যামাখশারী (রঃ)-এর পরে তফসীরের যেসব গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে, সেগুলোর অধিকাংশই উপরোল্লিখিত তফসীরত্রয় থেকেই গৃহীত এবং সেগুলোরই সার-সংক্ষেপ। সেগুলোর পর এমন তফসীর খুব কমই লেখা হয়েছে, যার স্বতন্ত্র কোন ভিত্তি রয়েছে। এমনকি ধীরে ধীরে তফসীর প্রণয়নের সাধারণ নিয়মই দাঁড়িয়ে যায় যে, যাই কিছু লেখা হোক না কেন, উল্লিখিত তফসীরের যেকোন একটির সনদ অনুসারে লেখতে হবে। কোরআনের কোন অনুবাদ কিংবা তার কোন তফসীরকে প্রামাণ্য হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট বলে মনে করা হতে থাকে যে, প্রতিটি বিষয়ের সনদ তফসীরের পূর্ববর্তী কোন না কোন গ্রন্থে পাওয়া যাবে। কাজেই আমাদের এ যুগে কোরআন মজীদের যেসব তরজমা বা তফসীর প্রকাশিত হয়েছে, সেসবের সবচাইতে বড় কোন বৈশিষ্ট্যের কথা যদি উল্লেখ করা যায়, তা হলে সম্ভবত তা হচ্ছে এসব তরজমা বা তফসীরের প্রতি পূর্ববর্তী তফসীরের সমর্থন রয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউই সেই সীমানা অতিক্রম করতে সাহস করেননি, যা ইবনে জারীর, ইমাম রাযী, ইমাম সুয়ূতী, ইমাম শাওকানী ও ইমাম বয়যাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন। সাধারণত তরজমা কিংবা তফসীরের বেলায় সেসব মতের উর্ধ্বে কোন কথা বলার বা মত প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করা হয় না, যা পূর্ববর্তী তফসীরসমূহের কোন একটি থেকে উদ্ধৃত হয়ে থাকে। এমন উদাহরণ খুব কমই পাওয়া যাবে যে, এই সহজ ও নিরাপদ পন্থা ছেড়ে কোরআনের জটিলতাসমূহের সমাধানের পথে কোন দুঃসাহসী পদক্ষেপ গৃহীত হয়ে থাকবে।

www.icsbook.info

আধুনিকতাবাদীদের পদ্ধতি ঃ

আধুনিকতাবাদী বলতে সেসমস্ত লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও মতবাদে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের কিছু কিছু বিশেষ মতার্দশ তৈরী করে নিয়েছেন এবং তারই ভিত্তিতে কোরআন মজীদকে ঢেলে সাজাতে প্রয়াস পেয়েছেন। আর এতে তারা ক্ষেত্রবিশেষে এমনি বাড়াবাড়ির আশ্রয় নিয়েছেন যে, অন্যান্য যাবতীয় বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণভাবে চোখ বন্ধ করে নিয়েছেন। এমনিভাবে আধুনিকতাবাদীরা পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও মতাদর্শকে নিজেদের পথনির্দেশক নির্ধারণ করে একান্ত নির্দয়তার সাথে কোরআনকেও সেই মতাদর্শের পেছনে পেছনে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। আমাদের সমাজে এই তফসীর পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করেছেন স্যার সৈয়দ আহমদ মরহুম। তারপর থেকে এই ফেতনা ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। আল্লাহই বলতে পারেন, তাঁর পবিত্র গ্রন্থ আর কতকাল এ ধরনের মূর্খ ও প্রবৃত্তির দাসদের যথেচ্ছ বিচরণের ক্ষেত্র হয়ে থাকবে।

উল্লিখিত পদ্ধতিসমূহের ওপর পর্যালোচনা ঃ

এবার আমরা উল্লিখিত পদ্ধতিগুলোর পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেষ্টা করব, এগুলোর প্রকাশ্য ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো কি কি?

সর্বাগ্রে রেওয়ায়েতাশ্রয়ীদের পদ্ধতিকেই ধরা যাক। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, উল্লিখিত সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে এটাই সর্বাধিক পবিত্র ও নিরাপদ তফসীর পদ্ধতি। এ পদ্ধতির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে তফসীর করতে গিয়ে রসূলে করীম (সঃ), সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও পূর্ববর্তী মনীষীদের বাণী ও মতামতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আর এ কথা সকলেই জানেন যে, কোরআন মজীদের তফসীর করার অধিকার হুযুরে আকরাম (সঃ)-এর চাইতে বেশী আর কারোই থাকতে পারে না। তাই নবী করীম (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর তফসীর অপেক্ষা যথার্থ ও বিশুদ্ধ তফসীরও অন্য কারও হতে পারে না। কিন্তু এ পদ্ধতিতে কয়েকটি ত্রুটিও রয়েছে, যা কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারেন না।

১. তফসীরের ক্ষেত্রে হুযুরে আকরাম (সঃ) থেকে ধারাবাহিক বর্ণনা খুব কমই রয়েছে। তেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর তফসীর সংক্রান্ত বর্ণনাও খুব

www.icsbook.info

বেশী নেই। তাই আমাদের তফসীর গ্রন্থসমূহ পরবর্তী ব্যাখ্যাতাদের মতামত ও বর্ণনায় ভরপুর হয়ে আছে। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পরবর্তী ব্যাখ্যাতাদের সে মর্যাদা কোথায়, যাতে তফসীরের বেলায় সেগুলোর ওপর পরিপূর্ণ নির্ভর করা যাবে।

২. তদুপরি আমাদের মুহাদ্দেসীন (রঃ)-এর বর্ণনামতেও তফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতগুলোতে সাবধানতার প্রতি ততটা লক্ষ্য রাখা হয়নি, যতটা রাখা হয়েছে সাংবিধানিক ও আইন-কানুন সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহের প্রতি। হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) তফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহের অমৌলিকতার ব্যাখ্যা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় করেছেন। আর এ প্রসঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যার গুরুত্ব সম্পর্কে সবাই জানেন। কাজেই আমাদের তফসীর গ্রন্থসমূহ যেসব ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতে ভরে রয়েছে, সেগুলোর শুদ্ধাশুদ্ধের পার্থক্য করা অত্যন্ত কঠিন।

৩. এসব রেওয়ায়েতের পরীক্ষা-পর্যলোচনা করে তাতে যে সারবস্তু রয়েছে, যদি সেগুলো পৃথক করা সম্ভব হয়ও, তবুও এককভাবে সেগুলোকে তফসীরের জন্য সিদ্ধান্তমূলক বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত করা কোনক্রমেই সঠিক হতে পারে না। কারণ, এসব রেওয়ায়েত বিশুদ্ধতার মাপকাঠিতে পরিপূর্ণভাবে টিকে যাবার পরেও ধারণার সন্দেহ থেকে মুক্ত নয়। কাজেই যদি কোরআন মজীদের তফসীরের ক্ষেত্রে এককভাবে এগুলোকেই সিদ্ধান্তসূচক বিষয় হিসেবে মেনে নেয়া হয়, তা হলে কোরআন মজীদের অকাট্যতাই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যা কোনক্রমেই সহ্য করা যায় না। সুতরাং অন্যান্য যুক্তি-প্রমাণের সমন্বয়ে নিঃসন্দেহে এসব রেওয়ায়েত কোরআন মজীদের সঠিক মর্ম সাব্যস্তকরণে যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে, কিন্তু এককভাবে এগুলোর সাহায্যে কোন অকাট্য সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না।

৪. আমাদের তফসীর গ্রন্থসমূহে একটি আয়াত, বরং কোন কোন সময় একেকটি শব্দের ব্যাপারে ব্যাখ্যাতা-বিশ্লেষকদের একাধিক বক্তব্য কোন রকম দলিল-প্রমাণের আলোচনা ব্যতিরেকেই উদ্ধৃত করে দেয়া হয়। এসব বক্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধীও হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই এ কথা বলাই বাহুল্য যে, তফসীরের এই পদ্ধতি একান্তই ভুল। কোরআন মজীদ যেহেতু প্রমাণের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ অকাট্য, সেহেতু উল্লিখিত একাধিক বক্তব্যের মধ্য থেকে সেগুলোই

www.icsbook.info

গ্রহণ করা কর্তব্য যা কোরআন মজীদের পূর্বাপর ধারাবাহিকতা এবং অন্যান্য নিদর্শনাবলী অনুযায়ী প্রমাণিত হবে। অন্যথায় কোরআনের অকাট্যতা আশঙ্কার সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

এবার ধরা যাক দার্শনিকদের তফসীর পদ্ধতি। দার্শনিকদের পদ্ধতিতে মৌলিক ত্রুটি হচ্ছে এতে নিজেদের দার্শনিক মতাদর্শকে ভিত্তি সাব্যস্ত করে কোরআনকে সে অনুযায়ী তৈরী করে নিতে চেষ্টা করা হয়েছে এবং যেখানেই কোরআন তাদের মতাদর্শের সাথে অসমঞ্জস হয়েছে, সেক্ষেত্রে নিজেদের মতাদর্শের সংশোধন করার পরিবর্তে এবং কোরআনকে কোরআনের মত থাকতে দেয়ার পরিবর্তে কোনক্রমে কোরআনকে ভেঙ্গেচুরে নিজেদের মতাদর্শের অনুযায়ী করে তোলাই ছিল তাঁদের একান্ত প্রচেষ্টা। পূর্বসূরি মনীষীবৃন্দের বক্তব্য থেকেও তাঁরা সেটুকুই গ্রহণ করেছেন, যাতে তাঁদের নিজেদের মতাদর্শের সমর্থন পাওয়া গেছে। আর যেসব বক্তব্য তাঁদের মতের বিরোধী, সেগুলো সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। এ ধরনের বহু উদাহরণ আমরা ইমাম রাযী (রাঃ)-এর তফসীরে পেতে পারি। তিনি অনেক সময় 'আশায়েরা' মতাদর্শের যথার্থতা প্রমাণ করতে গিয়ে তফসীরের সীমাকে এমনভাবেই লংঘন করেছেন যে, কোন আয়াত যদি পরিষ্কারভাবে আশায়েরা মতবাদের বিরোধী পরিলক্ষিত হয়েছে, তা হলে তার খণ্ডন করতে গিয়ে এমন কথা বলতেও দ্বিধাবোধ করতেন না যে, আমাদের যে মূলনীতি দার্শনিক দলিল-প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, তা শুধুমাত্র এ কারণে আহত হতে পারে না যে, একটি আয়াতের শব্দাবলী তার বিরোধী–যার প্রমাণ সম্পূর্ণত শ্রবণশক্তির ওপর নির্ভরশীল। অথচ তফসীরের এহেন প্রবণতার ফলে কোরআন যে একটি হেদায়াতদানকারী কিতাব তার যথার্থতা নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে কোরআন মজীদকে পথপ্রদর্শক এবং নেতৃত্বের মর্যাদা হারিয়ে কতিপয় দার্শনিক মতবাদের অনুসারী হয়ে চলতে হয়। আর অন্য শব্দে বলতে গেলে, এটা কোরআন যে আল্লাহ্‌র কালাম প্রকারান্তরে তারই অস্বীকৃতি।

অতঃপর তফসীরের গ্রন্থাবলীর অনুসারীদের পদ্ধতিটিতেও যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান, তা ফেকাহশাস্ত্রের ইমাম বা ফেকাহশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহের অনুসারীদের মাঝেও রয়েছে। ফেকাহশাস্ত্রের ইমামগণ কিংবা ফেকাহ গ্রন্থসমূহ যেমন নিজস্বভাবে কোন সনদ নয়, বরং প্রকৃত সনদ হচ্ছে আল্লাহ্‌র কালাম ও মহানবীর হাদীস বা সুন্নাহ এবং ফেকাহ শাস্ত্রের ইমাম কিংবা গ্রন্থের যেমন

www.icsbook.info

শুধুমাত্র সেটুকুই অনুসরণযোগ্য যেটুকু কোরআন ও সুন্নাহর কষ্টি পাথরে যাচাইয়ের দ্বারা প্রমাণিত, তেমনিভাবে আমাদের তফসীর গ্রন্থসমূহের মধ্যেও নিজস্ব পরিমন্ডলে কোন একটিরও সনদ হওয়ার উপযোগিতা নেই; সেগুলোরও সেসব কথাই যথার্থ ও সঠিক হতে পারে যা যথার্থ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও রেওয়ায়েতের কষ্টি পাথরের যাচাইয়ে টিকে থাকবে। সেজন্যই শুধুমাত্র এতটুকু বলে দেয়াই যথার্থতার প্রমাণ হতে পারে না যে, ইমাম রাযী (রঃ) কিংবা ইবনে জারীর (রঃ)-এর তফসীরে তা রয়েছে। বরং তা সঠিক কিনা তার ফয়সালা করার জন্য সম্পূর্ণভাবে অন্যান্য সূত্রের সাহায্য নিতে হবে।

আধুনিকতাবাদীদের পদ্ধতিতেও হুবহু সেসব ত্রুটি-বিচ্যুতিই রয়েছে যা মুতাকাল্লেমীন বা দার্শনিকদের পদ্ধতিতে বিদ্যমান। দার্শনিকরা যেমন গ্রীক দর্শনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের কিছু বিশেষ বিশেষ মতাদর্শ তৈরী করে নিয়ে সেগুলোকে শরীয়তের সার্টিফিকেট দেয়ার উদ্দেশ্যে ভেঙ্গেচুরে দিয়েছেন, তেমনিভাবে যারা পাশ্চাত্যের আধুনিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন, তাঁরাও নিজেদের সেসব মতামত কিংবা চিন্তাধারাকে মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার প্রয়াসে অত্যন্ত ধৃষ্টতার সাথে কোরআন মজীদের ওপর হাত সাফাই করেছেন। মিসরের আল্লামা তানতাভী এবং ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ মরহুম এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণকারীরা যা কিছু লিখেছেন, তা পড়লে অনুমান করা যাবে যে, আমাদের পূর্ববর্তী দার্শনিকরা তবুও কিছুটা মান রেখেছিলেন; তাঁরা নিজেদের মতবাদের সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের ভাষা, ব্যাকরণ, বর্ণনাধারা কিংবা অন্তত আনুক্রমিক হাদীস বা সুন্নাহর প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন। কিন্তু আমাদের আধুনিকতানুরাগীরা যাবতীয় সীমার বাঁধন ছিন্ন করেছেন এবং এমনি নির্লজ্জভাবে ছিন্ন করেছেন যেন মনে হয়, তাদের ধারণা মতে বর্তমান জগতে পড়ালেখা জানা লোকই রয়নি। বলাবাহুল্য, এ ধরনের তফসীরকে তফসীর বলাই ঠিক নয়, বরং এগুলোকে কোরআনের বিকৃতি বলাই বাঞ্ছনীয়।

তফসীরের বিশুদ্ধ মূলনীতি ঃ

এখন আমরা পাঠকবর্গের সামনে তফসীরের সে মূলনীতি উপস্থাপন করব, যা আমাদের মতে সঠিক ও বিশুদ্ধ এবং যার বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দেয় আমাদের বুদ্ধি ও আমাদের জ্ঞান এবং যা রেওয়ায়েত অনুসারেও বিশুদ্ধ বলেই মনে হয়।

www.icsbook.info

আমাদের মতে এ মূলনীতিগুলোর প্রতিই আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীরাও লক্ষ্য রেখেছিলেন।

এসব মূলনীতি দু'প্রকার ঃ প্রথমত সেগুলো— যাতে কারও কল্পনা বা সন্দেহ-সংশয়ের কোনই হাত নেই; সেগুলো কোন প্রকার মতপার্থক্য ব্যতিরেকেই কোরআনের তফসীরের উৎস। এসব মূলনীতির সাহায্যে যে তফসীর প্রণীত হবে, আমাদের ব্যবহারিক ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং আমাদের জ্ঞানের অভাবের দরুন অবশ্য তাতেও ভুল-ভ্রান্তির অবকাশ থাকবে, কিন্তু মূলনীতির নিরিখে তাই হবে বিশুদ্ধ ও সঠিক তফসীর। তাছাড়া নিজের ফলাফলের দিক দিয়েও তা বিশুদ্ধতার সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হবে।

দ্বিতীয়ত সেসব মূলনীতি, যা কল্পনাপ্রসূত। অর্থাৎ, কোরআন মজীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সেগুলো যথেষ্ট সহায়ক তো বটেই এবং সেগুলোর নির্দেশনায় উদ্দেশের বিকাশ ও জটিলতার সমাধানে মূল্যবান সাহায্যও লাভ হয়। কিন্তু যেহেতু এতে কল্পনা বা সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ রয়েছে, কাজেই সেগুলোর নির্দেশনা শুধুমাত্র ততটুকুই নেয়া উচিত, যতটা কোরআনের মূল বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এবং তাতে কোরআনের কোন ইঙ্গিত কিংবা সংকেতের বিকাশ ঘটে।

তফসীরের চারটি চূড়ান্ত মূলনীতি ঃ

তফসীরের চূড়ান্ত চারটি মূলনীতি সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবেই আলোচনা করব। কিন্তু কোরআনের তফসীর করতে গিয়ে সেগুলোর ব্যবহার হবে একই সঙ্গে। আর একত্রে ব্যবহার হলেই সেগুলোর মধ্যে দৃঢ়তা সৃষ্টি হবে, যাতে সেগুলো সন্দেহাতীত হয়ে ওঠবে। পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহার করা হলে সেগুলোর অধিকাংশই নিজের অকাট্যতা হারিয়ে ফেলবে।

প্রথম মূলনীতিটি হল— তফসীরের উৎস হিসেবে সে ভাষাকে সাব্যস্ত করা যাতে কোরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়েছে। তবে এখানে আমাদের উদ্দেশ্য সে সাধারণ আরবী ভাষা নয়, যাতে ইদানীংকালে লেখা বা কথা বলা হয়। বর্তমান আরবী ভাষার সাথে কোরআন মজীদের আরবী ভাষার সম্পর্ক নিতান্ত অল্প। কোরআন মজীদ যে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, তা বর্তমান মিসর ও সিরিয়ার পত্র-পত্রিকা কিংবা সেখানকার লেখক-গ্রন্থকারদের রচনায় খুঁজে পাওয়া

www.icsbook.info

যাবে না, বরং সে জন্য ইমরাউল কাইস, লাবীদ, যুহাইর, আমর ইবনে কুলসুম, হারেস প্রমুখ এবং আরবের জাহেলিয়াত আমলের খতীব-বক্তাদের বক্তব্যের অন্বেষণ করতে হবে। আর সে বক্তব্যের সাথে এমন গভীর ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করতে হবে, যাতে করে আসল-নকলের পার্থক্য করা যায়। তার বর্ণনাভঙ্গি এবং পারিভাষিক বিষয়গুলো বুঝতে যাতে কোন অসুবিধা না হয়। তার ভাল-মন্দ দিকগুলো যাতে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। তার ভেতরে সন্নিহিত সংক্ষিপ্ত বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা, তার ইশারা-ইঙ্গিত প্রভৃতি বুঝতে যাতে কোন জটিলতা না থাকে। বলা বাহুল্য, এ কাজটি যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু যারা কোরআন মজীদ বুঝতে চান, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁরা এই কঠিন বিষয়টিকে নিজের জন্যে সহজ করে নিতে পারবেন, কোরআন মজীদ বুঝার ব্যাপারে তফসীর ও অনুবাদের ক্ষেত্রে ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই করতে পারবেন না।

কোরআন মজীদের শব্দ ও বর্ণনাভঙ্গির মর্ম নির্ধারণ করতে হলে শব্দ কিংবা বর্ণনাভঙ্গির সে অর্থটিই গ্রহণ করা কর্তব্য, যা বক্তব্যের সাধারণ ব্যবহারে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। পক্ষান্তরে সে অর্থ কিছুতেই গ্রহণ করা চলবে না, যা অপ্রচলিত। কোরআন মজীদ প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। তার শব্দ বিরল অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এই মূলনীতিটির প্রতি যাঁরা লক্ষ্য রাখেননি, তাঁরা অনেক সময় শব্দের এমন অর্থও গ্রহণ করেছেন, যা সাধারণত আরবী ভাষায় প্রচলিত নয়। এ ধরনের ভুলের পরিণতি অবশ্য তেমন আশঙ্কাজনক নয়। বেশীর চাইতে বেশী কোন আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রচলিত অর্থের পরিবর্তে অপ্রচলিত অর্থ ধরে নেয়া হয়। কিন্তু এভাবে শব্দের বিরল অর্থ ধরে নিয়ে গোমরাহ বা পথভ্রষ্টের দল যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে, তার হিসাব নিলে বুঝা যায়, প্রচলিত অর্থের পরিবর্তে বিরল অর্থ ব্যবহার করার ফেতনা ধর্মের ওপর কত কঠিন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

কোরআনের ব্যাকরণের ব্যাপারেও সবচেয়ে নিরাপদ ও সন্তোষজনক পন্থা হল, ব্যাকরণের সাধারণ গ্রন্থের পরিবর্তে এর উৎস হিসেবে আরবী বক্তব্যকে গ্রহণ করা। আমাদের ব্যাকরণবিদরা অনুসন্ধান ও গবেষণা স্বল্পতার দরুন কোরআনের অনেক ব্যবহারকে বিরল ব্যবহারের আওতায় উল্লেখ করেছেন। অথচ কোরআন মজীদ আরবের প্রচলিত রীতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই প্রচলিত রীতি হবে এক রকম আর কোরআন মজীদের রীতি হবে অপ্রচলিত, এমন হতেই পারে না।

www.icsbook.info

মওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী (রঃ) এমন বহু রীতিকে প্রচলিত বলে প্রমাণ করে দিয়েছেন, যেগুলো ব্যাকরণবিদরা অপ্রচলিত বলে সাব্যস্ত করেছিলেন। এর উপকারিতা শুধু এই নয় যে, কোরআন মজীদের গৃহীত রীতিসমূহ বিরল ও ব্যতিক্রমের দ্বিতীয় পর্যায়ের তালিকায় পরিগণিত হওয়ার পরিবর্তে প্রচলিত রীতি-পদ্ধতির প্রাথমিক তালিকায় পরিগণিত হতে পারে, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথার্থ অর্থ নির্ণয় এবং সঠিক ব্যাখ্যা নির্বাচনেও তা প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে। সেজন্যেই একে সাধারণ জ্ঞানগত প্রচেষ্টা মনে করে উপেক্ষা করা উচিত নয়।

ভাষার ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে অলঙ্কারশাস্ত্রের সাথেও যোগাযোগ ঘটবে। বিশেষত এ কারণে যে, আমরা মুসলমানরা কোরআন মজীদকে একটি মু'জেযা বা অলৌকিক বিষয় হিসেবে মান্য করি এবং দাবীও করি যে, কোরআন মজীদের বাগ্মিতা, বাক-চারুতা ও সালঙ্কারত্বের কোন তুলনাই নেই। বলাবাহুল্য, কোরআন মজীদের এসব গুণাবলী যাচাই করার জন্য যে শাস্ত্র সর্বাধিক কার্যকর, তা হল অলঙ্কারশাস্ত্র। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পূর্ণভাবেই সেসকল নীতিনির্ভর, যা গ্রীকদের থেকে নেয়া হয়েছে। সুতরাং এ শাস্ত্রটি গ্রীক সাহিত্যের গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং অলংকার যাচাইয়ের মানদন্ড হতে পারে, কিন্তু একে কোরআনের গুণ-বৈশিষ্ট্য ও অলঙ্কার যাচাইয়ের কষ্টি সাব্যস্ত করা তা কয়লা মাপার পাল্লা দিয়ে স্বর্ণ বা আশরফী ওজনের অপচেষ্টারই নামান্তর হবে। এতে সন্দেহ নেই যে, আমাদের শাস্ত্রীরা এ শাস্ত্রকে আরবী ভাষার সাহিত্যিক চাহিদা এবং তার বিশেষ ঝোঁক ও অনুরাগসমূহের সাথে পরিচিত করে তোলার চেষ্টায় ত্রুটি করেননি, যাতে আরবী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য যাচাইর ব্যাপারেও কাজে লাগতে পারে। কিন্তু তাঁরা এ ব্যাপারে আরবী কাব্যধারার সীমা থেকে অগ্রসর হননি। এতেও তাঁরা অতটুকুই সফল হয়েছেন, দুটি অসমঞ্জস বস্তুর সম্মিলন ঘটাতে গিয়ে কেউ যতটুকু সফল হতে পারেন। যাই হোক, এ শাস্ত্রের দ্বারা যদি কিছু সম্ভব হয়ও, তবে শুধু আরবী কাব্যের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের নির্ণয় সম্ভব হতে পারে, কিন্তু কোরআন মজীদের সাহিত্যিক সৌন্দর্য-সৌকর্য ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় এর দ্বারা সম্ভব নয়। বরং তাতে সবচাইতে বড় আশঙ্কা এই যে, যদি এ শাস্ত্র সামনে রেখে কোরআন মজীদের গুণ-বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়, তা হলে কোরআনকে মু'জেযা হিসেবে মেনে নেয়া তো দূরের কথা, তাকে অলঙ্কার ও ভাষাশিল্পের দিক দিয়ে একটা উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ বলে অস্বীকার করে বসাও বিচিত্র

www.icsbook.info

নয়। কোরআন মজীদ এমন একটা কালাম বা বাণী, যা ওহীর উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে, যা আরব-আজমের সর্বাধিক সুবক্তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, যাতে সাগরের গতি এবং ঝড়ের শক্তি রয়েছে, যা বিদ্যুত চমকের মত সমগ্র আরব ভূমিকে প্রকম্পিত করে দিয়েছে এবং মুহূর্তের মধ্যে একেকজন মহাজ্ঞানীর মন-মস্তিষ্ক বদলে দিয়েছে। এমন গ্রন্থের সাহিত্যিক গুণ-বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্তমান অলঙ্কারশাস্ত্রের মাপকাঠিতে পরিমাপ করতে চেষ্টা করা গজ নিয়ে আকাশসমূহের পরিধি পরিমাপের চেষ্টারই শামিল।

এখানে আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানিয়ে দিচ্ছি যে, এ বিষয়ে মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী (রঃ)-এর কিতাব 'বালাগাত' প্রকাশিত হয়েছে। এতে মাওলানা সাহেব প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহের বিস্তারিত সমালোচনার পর কোরআনের অলঙ্কার যাচাইয়ে তার অপরাগতা প্রমাণ করে দিয়েছেন এবং সাথে সাথে সেসব মূলনীতিও নির্ধারণ করে দিয়েছেন যা কোরআনে হাকীমের ভাষা অলংঙ্কার যাচাইয়ের মাপকাঠির ভূমিকা পালন করতে পারে। এখন যে কাজটি বাকী রয়ে গেছে তা হল, মাওলানা সাহেব যে মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন, কোরআনের গবেষণা এবং জাহেলিয়াত যুগের আরব কথাশিল্পী ও কবিদের কথা ও কাব্য অনুসারে সে মূলনীতিসমূহের অধিকতর উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও সাক্ষ্য-প্রমাণ একত্রিত করে দেয়া, যাতে এ শাস্ত্রের অধ্যয়নকারীরা সহজে তার দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এটা আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগ্রহ যে, এদিকে কিছু দিনের মধ্যে জাহেলিয়াত আমলের সাহিত্যসম্ভার থেকে বেশ কিছু অংশ প্রকাশিত হয়ে গেছে, যা এ কাজে জ্ঞানী-মনীষীদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে।

কোরআনের বিন্যাস ঃ

কোরআন মজীদ বুঝার ক্ষেত্রে অপর যে বিষয়টির প্রতি সতর্কতা অপরিহার্য এবং যা যথার্থ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নির্ধারণে একটি সিদ্ধান্তমূলক কারক হিসাবে গণ্য হতে পারে, তা হল বক্তব্যের বিন্যাস। বিন্যাস অর্থ হল, প্রতিটি সূরারই একটা বিশেষ স্তম্ভ বা বিষয়বস্তু থাকা এবং সূরার সমস্ত আয়াত অত্যন্ত বিজ্ঞোচিত সামঞ্জস্য ও ধারাবাহিকতার সাথে সেই বিষয়বস্তুটির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা। সূরাটির বারংবার পাঠের ফলে যখন সূরার স্তম্ভটি সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং সূরার আয়াতগুলোর সম্পর্কও যখন তৎসঙ্গে সামনে এসে যায়, তখন সূরাটি বিভিন্ন

www.icsbook.info

আয়াতের একটি সংমিশ্রণের পরিবর্তে অত্যন্ত সুন্দর ও সুগঠিত একটি এককে পরিণত হয়। কোরআন বুঝার জন্য এই বিন্যাস বুঝা প্রাথমিক বিষয়। যতক্ষণ না এই বিন্যাসটি বুঝে আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন সূরার প্রকৃত মূল্যায়ন এবং তার প্রকৃত দর্শনই পরিষ্কার হতে পারে না; সে সূরার বিভিন্ন আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা নির্ধারণও সম্ভব নয়। কিন্তু এ বিষয়টি যথেষ্ট কঠিন। সেজন্যেই আমাদের মহামান্য তফসীরকারগণ সেদিকে খুব কমই মনোযোগ দিয়েছেন। আর কেউ কেউ কিছুটা মনোযোগ দিয়ে থাকলেও তা ছিল একান্তই ভাসা ভাসা। ফলে তাঁরাও এ বিষয়ে তেমন লাভজনক কোন অবদান রাখতে পারেননি। বরং তাঁরা একটি সূরার বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে যে ধরনের সম্পর্ক দেখিয়েছেন তা একান্ত লৌকিকতা বলেই প্রতীয়মান হয়। এ ধরনের সম্পর্ক যেকোন দুটি বিষয়ের মধ্যে স্থাপন করা যেতে পারে, তা সেগুলো পরস্পর যতই সম্পর্কহীন হোক না কেন। 'নযমে কোরআন' বা কোরআনের বিন্যাস বলতে আমাদের উদ্দেশ্য এই ধরনের লৌকিক বিন্যাস নয়; বরং সে বিন্যাসই আমাদের উদ্দেশ্য যা কোন উৎকৃষ্টতর বিজ্ঞজনোচিত নিবন্ধে হতে পারে এবং মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী (রঃ) তাঁর তফসীর 'নিযামুল কোরআন'-এ তা তুলে ধরেছেন।

সাধারণভাবে যেহেতু তফসীরকার আলেমগণ বিষয়টির প্রতি খুবই অল্প মনোযোগ দিয়েছেন, এমনকি অনেকে কোরআনের অবিন্যস্ততাকেই তার নিপুণতা বলে সাব্যস্ত করেছেন, সেজন্যে অনেকে কোরআনে বিন্যাসানুসন্ধানকে নিষ্প্রয়োজন প্রয়াস বলে গণ্য করেন। তাঁদের মতে কোরআন মজীদে বিন্যাস অনুসন্ধান করতে যাওয়া পাহাড় খুঁড়ে সূষিক বের করারই মত। তাঁদের মতে কোরআন মজীদের প্রত্যেকটি সূরা বিক্ষিপ্ত উপদেশ ও বিধি-নিষেধ সম্বলিত নির্দেশ সমষ্টি এবং এদিকটি সামনে রেখেই তার তেলাওয়াত করা বাঞ্ছনীয়। বলাবাহুল্য, এ ধরনের যাঁদের ধারণা (এবং এদের সংখ্যাই বেশী), তারা এতটা পরিশ্রম ও অধ্যবসায় স্বীকার করতে পারেন না, যা কোরআনের বিন্যাস অনুসন্ধান করতে প্রয়োজন। সে কারণেই সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে, মানুষের মনে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেয়া যে, কোরআনের মধ্যে বাস্তবিকই বিন্যাস রয়েছে। এখানে আমরা কোরআনের বিন্যস্ততার কিছু যুক্তি-প্রমাণ পেশ করব।

১. এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম যে বিভ্রান্তির অপনোদন প্রয়োজন তা হচ্ছে কোরআন মজীদে বিন্যাসের দাবীদার আলেমগণ শুধু এ যুগেই আবির্ভূত হননি; বরং পূর্বেও

www.icsbook.info

অনেকে এ দাবী করেছেন এবং কেউ কেউ কোরআনের বিন্যাস সম্পর্কে গ্রন্থও রচনা করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) তাঁর 'এত্কান' -এ লেখেছেন ঃ

"আল্লামা আবু জাফর ইবনে জুবাইর আবু হাইয়্যান কোরআনের বিন্যাস সম্পর্কে একটি বিশেষ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার নাম রেখেছেন "আলবুর্হান ফী মুনাসিবাতি তারতীবে সূরাতিল কোরআন'। আর আমাদের সমসাময়িকদের মধ্যে শায়েখ বোরহানুদ্দীন বাকায়ীর তফসীর 'নাজমিদ্দুরার ফী তানাসিবিল আয়াতে ওয়াস্সূয়ার' গ্রন্থটিও এ বিষয়েই লিখিত হয়েছে।"

আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এ বিষয়ে নিজের একটি গ্রন্থের কথাও উল্লেখ করেছেন যাতে তিনি কোরআনের বিন্যাস ছাড়া কোরআনের অলৌকিকত্বের বিষয়টিও বিশ্লেষণ করেছেন এবং সে প্রসঙ্গেই কোরআনের সুবিন্যস্ততার গুরুত্ব তিনি নিম্নলিখিতভাবে স্বীকার করেছেন ঃ

"শৃংখলা ও বিন্যাসের জ্ঞানটি অত্যন্ত উত্তম জ্ঞান। কিন্তু বিষয়টি কঠিন হওয়ার কারণে তফসীরকারগণ এর প্রতি খুব কমই মনোনিবেশ করেছেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী নিয়মানুবর্তী ছিলেন। তিনি বলতেন, "হেকমতে কোরআন বা কোরআনী জ্ঞানের প্রকৃত ভান্ডার তার ধারাবাহিকতা ও বিন্যাসের ভেতরেই লুকিয়ে আছে।"

ইমাম রাযী (রঃ) তাঁর তফসীরে বিন্যাসের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টা তেমন একটা লাভজনক প্রমাণিত হয়নি। কারণ, কোরআনের বিন্যস্ততা প্রতীয়মান করার জন্য যে পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল, সেজন্যে তাঁর মত পরিব্যস্ত লোকের পক্ষে সময় দেয়ার অবকাশ ছিল না। তথাপি এ বিষয়টির গুরুত্ব তিনি যতটা অনুভব করতেন তাঁর তফসীরের জায়গায় জায়গায় তা প্রকাশ করেছেন। অতএব ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে তিনি লেখেছেন-

"অনেকে বলেন, এ আয়াতটি সেসব লোকের উত্তরে অবতীর্ণ হয়েছে যারা দুষ্ট বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে বলত যে, কোরআন যদি অনারব ভাষায় অবতীর্ণ হত তবেই ভাল ছিল। কিন্তু এ ধরনের কথা বলা আমার মতে আল্লাহর কিতাবের প্রতি কঠিন অবিচার। এর অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, কোরআনের আয়াত-গুলোতে একটির সাথে অপরটির কোন যোগসূত্রই নেই। অথচ এতে কোরআনে হাকীমের ওপর একটা বিরাট আপত্তি উত্থাপন করা হয়।

www.icsbook.info

এমতাবস্থায় কোরআনকে মু'জেযা বলে মেনে নেয়া তো দূরের কথা, একে একটা বিন্যস্ত গ্রন্থ বলাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আমার মতে সঠিক বক্তব্য হল, এই সূরাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত কালাম। অতপর তিনি প্রায় আঠারটি ছত্রে সূরার সংক্ষিপ্ত তফসীর লেখে বলেন ঃ "যেসব লেখক বাস্তব সত্য অস্বীকারে অভ্যস্ত নন, তাঁরা স্বীকার করে নেবেন যে, সূরাটির তফসীর যদি সেভাবে করা হয় তা হলে সমগ্র সূরাটিকে একই বিষয়বস্তু সম্বলিত দেখা যাবে এবং এর প্রতিটি আয়াত একই তাৎপর্যের ইঙ্গিত করবে।"

এ পর্যায়েরই একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ লেখক হচ্ছেন আল্লামা মখদুম মহায়েমী (রঃ)। তাঁর তফসীর 'তাফসীরুর রাহমান ওয়া-তাইসীরুল মান্নান।' সেটি 'তফসীরে মহায়েমী' নামে প্রসিদ্ধ। তাতে তিনি কোরআনের আয়াতসমূহের বিন্যস্ততার বর্ণনা দিতে যথাসাধ্য চেষ্ট করেছেন। তবে একথা স্বতন্ত্র যে, সে প্রশ্নে তিনি সফল হয়েছেন কিনা? আর যদি হয়েও থাকেন তবে কতটা?

এ মতেরই আরেক মনীষী আল্লামা ওলীউদ্দীন মালভী। কোরআনের বিন্যাস সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে এই ঃ

"যারা মনে করেন, কোরআনের অবতরণ যেহেতু সময় ও অবস্থার দাবী অনুসারে অল্প অল্প করে হয়েছে, সেহেতু এতে বিন্যস্ততার সন্ধান করা উচিত নয়– তাদের বিরাট বিভ্রান্তি ঘটেছে। কোরআন মজীদের অবতারণ নিঃসন্দেহে অবস্থার প্রেক্ষিতে অল্প অল্প করে ঘটেছে, কিন্তু যেভাবে তা সংকলিত করা হয়েছে, তাতে গভীর অভিজ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।"

মুসলিম সমাজের প্রসিদ্ধ ও বিদগ্ধ ওলামায়ে কেরামের উপরোল্লিখিত বক্তব্য এ বিষয়ে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, কোরআন মজীদে বিন্যাসের প্রবক্তা শুধুমাত্র মাওলানা হামীদুদ্দীন (রঃ) কিংবা তাঁর শিষ্যবর্গই নন, বরং অন্যান্য ওলামাও বিষয়টি উপলব্ধি করেছেন এবং তার সাক্ষ্যও দিয়েছেন।

তদুপরি বিষয়টির আরো একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, যেসব আলেম 'বিন্যাস'কে অস্বীকার করেছেন, তাঁরাও এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। তার প্রমাণ, যে ওলামা বিন্যাসের প্রবক্ত নন, তাঁরাও অধিকাংশ সময় ব্যাখ্যার সমর্থনে কালাম বা বক্তব্যের অগ্র-পশ্চাৎ সম্পর্ক তুলে ধরেন। আর একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, অগ্র-পশ্চাৎ সম্পর্ককে তখনই দলিল হিসাবে উপস্থাপন

www.icsbook.info

করা যেতে পারে, যখন তাকে একটা সুবিন্যস্ত কালাম বলে স্বীকার করা হবে। প্রসিদ্ধ তফসীরগুলোতে এ বিষয়টি ইবনে জারীর (রঃ)-এর তফসীরেও পরিলক্ষিত হয় এবং কাশ্‌শাফেও। তাঁদের দুজনই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে সে ব্যাখ্যাটিতেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন এবং অগ্রাধিকার দেন, যেটিকে তাঁরা কালামের বিন্যাসের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখতে পান। এতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যদিও তাঁরা কোরআনের বিন্যস্ততাকে তার জটিলতার দরুন সব ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করে দেয়ার নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখতে পারেননি, কিন্তু যেখানেই বিন্যাসের মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে তাকে একটি বক্তব্যের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। ইমাম রাযী (রঃ)-এর আলোচনা আমরা এক্ষেত্রে করছি না। তার কারণ, কোরআনের বিন্যাস প্রশ্নে তিনি উপরোল্লিখিত মনীষীদ্বয় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। তিনি কালামের বিন্যস্ততার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের (যেমন তাঁর বক্তব্যের দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায়, যা আমরা ওপরে উদ্ধৃত করেছি।) কঠিন প্রবক্তা ছিলেন। তিনি প্রত্যেকটি আয়াতের বেলায়ই তা বর্ণনা করতে চেষ্টা করেন, যদিও তাতে যেমন আমরা নিবেদন করেছি, তিনি তেমন একটা সফলকাম হতে পারেননি।

যাঁরা নিজেদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে কোরআনের বিন্যাসকে অস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁরা সে অস্বীকৃতির পক্ষে যে দলিল-প্রমাণ উপস্থিত করেছেন, সেগুলো এতই দুর্বল যে, অন্যদেরকে বাদ দিয়ে তাঁরা নিজেরাও তাতে আশ্বস্ত হতে পারেননি। তাঁরা বলেন, কোরআন মজীদ প্রয়োজন ও অবস্থার প্রেক্ষিতে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে বলে তাতে কোন বিন্যাস নেই। তাঁদের এ দলিলটি শুধুমাত্র এ বাস্তবতার দ্বারাই খন্ডিত হয়ে যায় যে, লম্বা সূরাসমূহের কোন কোনটি এবং ছোট সূরার অধিকাংশগুলো গোটা গোটাই একবারে অবতীর্ণ হয়েছে। বলাবাহুল্য, এসব সূরার অবিন্যস্ততার ব্যাখ্যা উল্লিখিত দলিলের দ্বারা হতে পারে না। কাজেই ইমাম রাযী (রঃ) এরই ভিত্তিতে তাঁদের বিরুদ্ধে সে আপত্তি তুলেছেন, যা আমরা ওপরে উদ্ধৃত করে এসেছি।

আমাদের মতে, এঁদের অস্বীকৃতির কারণ কোন দলিল-প্রমাণ নয়; বরং শুধুমাত্র এ কারণে যে, তাঁদের ধারণায় কোরআনে বিন্যস্ততার দাবী করা এবং সব ক্ষেত্রে তা তুলে ধরতে না পারা একটা বিরাট দুর্বলতার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তাতে ইসলাম বিরোধীরা কোরআনের ওপর প্রশ্ন করার একটা পথ পেয়ে বসবে

www.icsbook.info

এবং তা গোটা উম্মত বা মুসলিম জাতির জন্য হবে একান্ত ক্ষতিকর। এ বিষয়টি থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশেই তাঁরা বিন্যাসকে গোড়াতেই অস্বীকার করে দেয়া সমীচীন বিবেচনা করেছেন। তাঁরা যদিও কাজটি নেক নিয়তে করেছেন, কিন্তু এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই অস্বীকৃতির অপকারিতা তার চেয়ে বহুগুণ বেশী হয়েছে, যার থেকে কোরআনকে রক্ষা করতে গিয়ে তাঁরা এ পথ অবলম্বন করেছিলেন। এ ব্যাপারে সঠিক পথ এই ছিল যে, বিন্যাসকে যতটা সম্ভব প্রতীয়মান করতে চেষ্টা করতেন আর যেখানে সম্ভব না হত সেখানে কালামের একটা প্রকাশ্য দোষকে বিচক্ষণতা প্রমাণ করতে চেষ্টা না করে নিজেদের জ্ঞানের স্বল্পতা বলে স্বীকার করে নিতেন।

৩. যাঁরা কোরআনের সংগ্রহ এবং সংকলন সম্পর্কিত রেওয়ায়াতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা এই বাস্তবতা অস্বীকার করতে পারেন না যে, কোরআন যদিও অল্প অল্প করে নাযিল হয়েছে, কিন্তু আয়াতসমূহকে হুযুর আকরাম (সঃ)-এর নির্দেশানুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়েছে। যে আয়াতই অবতীর্ণ হত হুযুর (সঃ) স্বয়ং সূরার ভেতরে তার স্থান নির্ধারণ করে দিতেন এবং ওহী লেখক সাহাবিগণকে আদেশ দিতেন যে, এ আয়াতগুলোকে অমুক সূরার অমুক জায়গায় লেখে রাখ। ওহী লেখক সাহাবিগণও হুযুরের হেদায়াত অনুসারে সেসব আয়াত তাঁরই নির্ধারিত জায়গায় লেখে রাখতেন। সুতরাং এ বিষয়ে সমগ্র জাতি একমত যে, আয়াতসমূহের বিন্যাস হুযুরে আকরাম (সঃ)-এর হুকুম মোতাবেকই হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, কোরআন মজীদে যদি বিন্যস্ততাই না থাকবে, তা হলে মহানবী (সঃ) এ ধরনের নির্দেশ দিতেন কেন? তা হলে তো অবতরণকালীন বিন্যাসই ছিল উত্তম। যেভাবে আয়াত অবতীর্ণ হতে থাকত, সেভাবেই সেগুলো লেখিয়ে রাখতেন। অবতরণকালীন বিন্যাস বাদ দিয়ে যখন একটা বিশেষ বিন্যাস ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তখন বিষয়টি চিন্তা করতে হবে যে, তা হলে এই নয়া বিন্যাস পদ্ধতি গ্রহণ করার কি কারণ থাকতে পারে? পরিষ্কার কথা যে, এ প্রশ্নের যথার্থ ও সঠিক উত্তর একটাই হতে পারে। আর তা হচ্ছে, এই বিন্যাস বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য অনুসারে স্থাপিত। ওপরে আমরা আল্লামা মালভী (রঃ)-এর যে বক্তব্য উদ্ধৃত করে এসেছি, তাতে এদিকেই ইঙ্গিত বুঝা যায়।

আমাদের এ মতের সমর্থন এর দ্বারাও হয় যে, কোরআন মজীদের কোন হুকুম নাযিল হওয়ার পর যদি এমন কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়, যা সে হুকুমের

www.icsbook.info

কোন প্রকার সংশোধন কিংবা লঘুকরণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা যে আয়াত নাযিল করতেন তা সাবেক মূল আয়াতের যত দীর্ঘ দিন পরেই নাযিল হোক না কেন, সাধারণত তাকে সাবেক হুকুমের পাশেই স্থান দেয়া হেয়েছে। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত কোরআনেও বিদ্যমান রয়েছে। আর যদি কোথাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়ে থাকে, তবুও বাক্যবিন্যাস এবং বিষয়বস্তুর প্রকৃত গুরুত্ব উপেক্ষা করা হয়নি।

কোরআন মজীদে পৃথক পৃথক সূরার স্থাপনা এবং তার কোনটার দীর্ঘ এবং কোনটার হ্রস্ব হওয়াও এরই প্রমাণ যে, কোরআন মজীদে বিন্যস্ততা রয়েছে। কোরআন যদি একটা অবিন্যস্ত কিতাবই হয়, তা হলে পৃথক পৃথক সূরা গঠন করার কি প্রয়োজন ছিল? প্রতিটি বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এ কথা বুঝতে পারেন যে, সূরাসমূহের বিষয়বস্তুই যদি পৃথক পৃথক না হত এবং প্রতিটি সূরাই যদি সুনির্দিষ্টভাবে ঐক্যসূত্রে গাঁথা বিশেষ একটি ভিত্তি সম্বলিত না হত, তা হলে তেলাওয়াত ও মুখস্থ করার দৃষ্টিতে সবচেয়ে সহজ বিন্যাস হত এই যে, কোরআন যারা সংগ্রহ করেছেন তাঁরা আয়াতের একেকটা সমষ্টি নিয়ে সমান সমান সূরায় ভাগ করে বসিয়ে দিতেন। কিন্তু তাঁরা যখন এমন করেন নি, বরং পৃথক পৃথক সূরা গঠন করেছেন, যার কোনটা ছোট কোনটা বড়, তখন তার কারণ এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না যে, এসব সূরার বিষয়বস্তুই ভিন্ন ভিন্ন এবং প্রত্যেকটি সূরাই বিষয়বস্তুর ঐক্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত।

কোন রকম মতবিরোধ ব্যতীত সমস্ত কোরআনে সূরাসমূহের বর্তমান যে বিন্যাস, তাও এ বিষয়েরই একটা বিরাট প্রমাণ যে, কোরআন মজীদ একটি সুবিন্যস্ত গ্রন্থ। তার মানে, কোরআনের সূরাগুলোকে যেভাবে আগে-পরে সাজানো হয়েছে, তাও কোন একটা কারণ ছাড়া হয়নি; হতে পারে না। সেজন্য এই প্রশ্নটি নিয়ে চিন্তা করতে হবে যে, এই অগ্রপশ্চাৎ কোন মূলনীতির ভিত্তিতেই হয়ে থাকবে। বাহ্যিক দিক দিয়ে এই অগ্রপশ্চাতের ব্যাপারে সূরাসমূহের হ্রস্বতা কিংবা দীর্ঘতারই সবচেয়ে বেশী দখল থাকা উচিত ছিল, কিন্তু কোরআন মজীদের ওপর চোখ রাখামাত্র যে কেউ অনুমান করে নিতে পারেন যে, কোরআনে এ বিষয়টির এতটুকু লক্ষ্য রাখা হয়নি। কারণ, এই বিন্যাসে সূরা ফাতেহাকে সূরা বাকারার পূর্বে স্থান দেয়া হয়েছে। অথচ এ দুটো সূরার আয়তনে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তেমনিভাবে সূরা কাওসার– যেটি কিনা কোরআন মজীদের সবচাইতে ছোট

www.icsbook.info

সূরা– এমন কতিপয় সূরার পূর্বে স্থাপন করা হয়েছে, যেগুলো আয়তনের দিক দিয়ে তার চাইতে বড় বা দীর্ঘ। এ কথাও স্বীকৃত যে, এই বিন্যাসও অবতরণকালীন বিন্যাস নয়। কারণ, অবতরণের দিক দিয়ে প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত অনুযায়ী কোরআনে সর্বপ্রথম সূরা 'ইকরা'কে স্থান দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু সবাই জানেন, তাকে রাখা হয়েছে কোরআনের সর্বশেষ পারাটিতে। এই পরিস্থিতি মানুষকে সূরার পরিমাণ এবং অবতরণের অগ্রপশ্চাৎ ছাড়াও বর্তমান পূর্বাপরতার ব্যাপারে অন্য কোন কারণ অনুসন্ধানে বাধ্য করে। আমাদের মতে বর্তমান এই পূর্বাপরতার কারণ হচ্ছে সূরার মর্মগত সামঞ্জস্য। হয়ত আমাদের দাবী সম্পর্কে কেউ এ আপত্তি উত্থাপন করে বসবেন যে, সূরাসমূহের বিন্যাস তো সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর আমলেই হয়েছে। কাজেই এর রহস্য বা তাৎপর্য সম্পর্কে মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের মতে তাঁদের এ ধারণা যথার্থ নয়। প্রথমত সূরাসমূহের ধারাবাহিকতা হুযুরে আকরাম (সঃ)-এর নির্দেশ অনুসারেই সাব্যস্ত হয়েছে। দ্বিতীয়ত কিছুক্ষণের জন্য যদি ধরেও নেয়া যায় যে, সূরাসমূহের ক্রমবিন্যাস সাহাবা (রাঃ)-দের মতেই হয়েছে, তাতে একথা কেন অপরিহার্য হয়ে পড়বে যে, সাহাবাগণ সূরাগুলোকে এমনি কোন প্রকার মর্মগত সামঞ্জস্য ছাড়াই একত্রিত করে দিয়ে থাকবেন? অথচ এ ব্যাপারে সবাই অবগত যে, সূরা 'বারাআত-এর স্থান নির্ধারণ নিয়ে যখন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, তখন শেষ পর্যন্ত কোরআন মজীদের বিন্যাসের সাহায্যেই বিষয়টির সমাধান হয়েছিল এবং মর্মগত সামঞ্জস্যের ভিত্তিতেই সূরা 'আনফাল'-এর পরে স্থান দেয়া হয়েছিল।

আমরা একথা তাঁদের ধারণার প্রেক্ষিতে বলেছি, যাঁরা বলেন যে, সূরাসমূহের ক্রমবিন্যাস সাহাবাদের যুগে এবং তাঁদেরই মতে সাব্যস্ত হয়েছে। তা না হলে আমাদের মতে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশানুযায়ী হুযুরে আকরাম (সঃ) নিজেই সূরাসমূহকে বিন্যস্ত করেছেন। আমাদের এ দাবীর সমর্থন কোরআন ও হাদীস উভয়ের দ্বারাই হয়।

আল্লাহ তাআলা সূরা 'কিয়ামাহ'-তে এরশাদ করেছেন–

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.

নিঃসন্দেহে আমার দায়িত্ব হল কোরআনকে সংকলিত করা এবং শুনানো। অতএব যখন আমি শুনাই, তখন যা শুনানো হয় তার অনুসরণ কর। অতঃপর আমার দায়িত্বে রয়েছে তার বিশ্লেষণ।

www.icsbook.info

মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী (রঃ) উল্লিখিত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

এ আয়াতটিতে তিনটি বিষয় বলা হয়েছে। একটি হল কোরআন মজীদ নবুয়তের আমলেই হুযুরে আকরাম (সঃ)-কে বিশেষ ক্রমবিন্যাস মোতাবেক শুনিয়ে দেয়া হয়েছে। কারণ, এ ওয়াদা যদি হুযুর (সঃ)-এর পরে বাস্তবায়িত করা উদ্দেশ্য হত, তা হলে হুযুরকে এই সংগ্রহ ও ক্রমবিন্যাসের অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হত না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে– দ্বিতীয় কেরাত অনুযায়ী–যা জমা করার পরে হয়েছে। হুযুরের প্রতি নির্দেশ হল, আপনি উম্মতকে কোরআন শোনান। আর একথা বুদ্ধি ও বিবেচনার দিক দিয়ে অসম্ভব যে, হুযুরের প্রতি কোন একটি নির্দেশ প্রচারের উদ্দেশে এসেছে, অথচ তা তিনি উম্মত পর্যন্ত পৌঁছে দেননি।

কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ.

হে রসূল! তোমার প্রতি যে বস্তুটি অবতীর্ণ করা হয়েছে তা মানুষের মাঝে পৌঁছে দাও। যদি তুমি তা না কর, তা হলে তার অর্থ এই হবে যে, তুমি নিজের রেসালাতের ফরয আদায় করলে না।

এই সাধারণ নির্দেশের দাবী হল সেই শেষ কেরাত অনুযায়ী, যা লওহে মাহফুযে রয়েছে, হুযুর আকরাম (সঃ) মানুষকে কোরআন মজীদ শুনিয়েছেন। এই শেষ কেরাতটি আমলের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ হওয়া অত্যাবশ্যক।

তৃতীয় কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ ও ক্রমবিন্যাসের পরে আল্লাহ্ তাআলা যদি কোন সাধারণ নির্দেশকে অসাধারণ কিংবা কোন অসাধারণ নির্দেশকে সাধারণ করতে চেয়ে থাকেন, অথবা কোন বিষয়কে পূর্ণতা দান করতে ইচ্ছা করে থাকেন, তবে এ সমস্তই করে দিয়েছেন। কোরআন মজীদ হুযুরে আকরাম (সঃ)-এর যুগেই এ সমস্ত ধাপ অতিক্রম করে নিয়েছে। এ সত্যটি সবাই জানেন যে, মহানবী (সঃ) মানুষকে গোটা গোটা সূরা শোনাতেন। আর এটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, যদি না কোরআন মজীদ একটি নির্দিষ্ট বিন্যাস অনুযায়ী তাঁকে শোনানো হয়ে থাকে। এই ক্রমবিন্যাস অনুযায়ীই সাহাবিগণ হুযুরের নিকট কোরআনের শিক্ষা নিয়েছেন। রেওয়ায়েতে এ বিষয়টি বিশদভাবে বলা হয়েছে যে, তিনি আয়াতসমূহকে যথার্থ

www.icsbook.info

জায়গায় স্থাপন করার নির্দেশ দান করতেন আর তাঁর এ নির্দেশ যথাযথ বাস্তবায়িতও হত। পরে যদি কোন বিশ্লেষণমূলক আয়াত অবতীর্ণ হত, তখন সেটিকেও যথাস্থানে লেখে রাখা হত। এভাবে কোরআন মজীদ যখন পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) (বিশুদ্ধ হাদীস মতে) হুযুর আকরাম (সঃ)-এর কাছে শেষবার পূর্ণ কোরআন শোনালেন। এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবার পর কোরআন মজীদের বিন্যাস সংক্রান্ত বহু জটিলতার সমাধান আপনা থেকে হয়ে যায়। — (তফসীর ঃ সূরা কিয়ামাহ্)

ইমাম হামীদুদ্দীন ফারাহী (রঃ) কর্তৃক কোরআন থেকে গৃহীত উপরোল্লিখিত পর্যালোচনা দ্বারা অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, কোরআন মজীদ যেভাবে এবং যে বিন্যাসের সাথে আমাদের এ যুগে বিদ্যমান, এ বিন্যাস আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ ও হেদায়াত অনুযায়ী নবুয়তের আমলে পূর্ণতা লাভ করেছিল। কিন্তু যেহেতু তখন আরবদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা ছিল অল্প এবং কাগজ-কলম প্রভৃতি লেখার উপকরণগুলোও ছিল একান্ত দুষ্প্রাপ্য, তাই দীর্ঘকাল ধরে কোরআন মজীদ সংরক্ষণ করা হয়েছিল খেজুরের পাতা, হাড়, শিলাখণ্ড এবং হাফেযদের বক্ষপটে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-ই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি নবী করীম (সঃ)-এর দেয়া ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী বিক্ষিপ্ত আয়াতসমূহকে গ্রন্থায়িত করেন। অতপর হযরত ওসমান (রাঃ) নিজের শাসনামলে সে সংগ্রহ থেকে আরো কতিপয় কপি করিয়ে সেগুলো বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রে পাঠিয়েছেন।

কোরআন মজীদের সুবিন্যস্ত হওয়ার আরো একটি বড় প্রমাণ এই যে, কোরআন সর্বজনস্বীকৃতভাবে একটা উচ্চতর মানের কালাম। বস্তুত এমন কোন কালামই উচ্চ মানের কালাম হতে পারে না, যা সুবিন্যস্ত নয়। যেকোন কালামের প্রকৃত গঠন হচ্ছে তার বিন্যস্ততা। বিন্যাসকে পৃথক করে নিলে কালাম বা রচনা শুধু যে তার সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য থেকেই বঞ্চিত হয়ে পড়ে তাই নয়, বরং তখন গোটা রচনাটি সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। যে কালাম বা রচনা বিন্যাস বিবর্জিত, মানুষ সেটিকে মূর্খতার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে এবং অন্তত কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তা নিয়ে সময়ের অপচয় করতে রাজি হয় না। কোরআন মজীদ সম্পর্কে এ কথা সারা দুনিয়াই অবগত যে, সে আরবদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছে, যেন তারা তার মত কোন একটা সূরা উপস্থাপন করে। কিন্তু আরববাসীরা তাদের বাগ্মিতা, সালঙ্কার ভাষাজ্ঞান সম্পর্কিত সমস্ত গর্ব সত্ত্বেও কোরআনের সে

www.icsbook.info

চ্যালেঞ্জের উত্তরে কোন একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সূরাও উপস্থাপন করতে পারেনি। কোরআনের এই সাহিত্যিক ও মর্মগত মাহাত্ম্যের বিবেচনায় প্রথম যে জিনিসটি তাতে থাকা উচিত, তাই হচ্ছে বিন্যাস। কারণ, বিচ্ছিন্ন ও বিন্যাস বিবর্জিত কোন গ্রন্থের পক্ষেই আরব বাগ্মী ও আলঙ্কারিকদেরকে প্রভাবিত করা সম্ভব ছিল না।

এখানে লক্ষণীয়, কোরআন যে বিস্মিত ও হতভম্ব করে দেয়ার মত এক বিষয়, তার প্রমাণ, কোরআন যেখানেই আরবদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছে সেখানেই তাদের কাছে নিজের মত একটি গ্রন্থ কিংবা দশটি আয়াত অথবা হাদীস حديث من مثله (হাদীস মিম মিস্‌লিহী) বা কমসে কম একটি সূরা উপস্থিত করার দাবী করেছে, এর চাইতে কম দাবী করেনি। কারণ, এর চাইতে কম হতে গেলে কালাম বা রচনার বিন্যাসশৈলীর প্রকাশ ঘটে না, যা প্রকৃতপক্ষে তার মূল প্রাণ। সে কারণেই আরব-আজমের সমস্ত ভাষাতত্ত্ববিদ মনীষীবৃন্দ এ বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, কালাম বা রচনার আসল প্রাণ হচ্ছে তার বিন্যাস। এর মাধ্যমেই তার যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটতে পারে। এই বাস্তবতা স্বীকার করে নিতে কারও মনে যদি দ্বিধার সৃষ্টি হয়, তা হলে তিনি ভালর চাইতে ভাল যেকোন সালঙ্কার রচনা নিয়ে তার বিন্যাস নষ্ট করে দিয়ে দেখতে পারেন। দেখা যাবে, তখন সে রচনার যাবতীয় শক্তি মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

কোরআনের সুবিন্যস্ততা সম্পর্কে আমরা এই কয়েকটি প্রমাণ এ উদ্দেশেই উপস্থিত করেছি যে, পাঠক মহোদয়ের কারো মনে যদি এমন কোন ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় যে, কোরআন একটা বিক্ষিপ্ত, অবিন্যস্ত গ্রন্থ এবং এই অবিন্যাস্ততাই তার আদত বৈশিষ্ট্য, তা হলে যেন সে ভুলটি দূর হয়ে যেতে পারে এবং যাতে কোরআন বুঝতে গিয়ে পূর্ণ ভরসা সহকারে তার সুবিন্যস্ততাকে পথপ্রদর্শক করে নিতে পারেন।

বিন্যাস অনুসন্ধানের মূলনীতি ঃ

কিন্তু কোরআনের সুবিন্যস্ত কালাম হওয়ার দলিল-প্রমাণ বর্ণনা করার চাইতে সে মূলনীতিগুলো বর্ণনা করা বেশী জরুরী, যা সে বিন্যাসের অনুসন্ধান করতে গিয়ে দিশারীর ভূমিকা পালন করতে পারবে। কেউই কোরআনের সুবিন্যস্ততা এ কারণে অস্বীকার করে না যে, তাঁর কাছে তার কোন গুরুত্বই নেই কিংবা তার

www.icsbook.info

অস্তিত্বের প্রমাণ তার জন্যে স্পষ্ট নয়, বরং তাঁদের অস্বীকৃতির প্রকৃত কারণ হচ্ছে এই যে, বিন্যাসের অনুসন্ধান এবং তাঁর নির্ণয় করাটা আসলেই যথেষ্ট জটিল কাজ। এই জটিল বিষয়টিকে যদি কোনক্রমে সহজ করে নেয়া যায়, তা হলে তার মূল্য-মর্যাদা এবং কোরআনের মর্মোদ্ধারে তার গুরুত্ব অস্বীকার করার কোন অবকাশ কারও নেই।

আমাদের পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতে বিন্যাস অনুসন্ধানের মূলনীতি বর্ণনা করাটা যথেষ্ট কঠিন, বরং প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের কয়েকটি সাক্ষাতও এতদুদ্দেশে যথেষ্ট হতে পারে না। কাজেই সঠিক পন্থা হচ্ছেপূর্ণ বিস্তৃতি সহকারে শুধু সে মূলনীতিগুলো বলে দেয়া, যা কোরআনের বিন্যাস অন্বেষণে পথনির্দেশ করবে। তারপর সে মূলনীতিগুলো কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে সে বিষয়ের অনুশীলন। মূলনীতি সম্পর্কে যতটা জানার প্রয়োজন সেজন্যে এ যুগের সবচেয়ে মহান খাদেমে কোরআন মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী (রঃ)-এর রচনাসমূহের অধ্যয়ন করা যেতে পারে। বিশেষ করে তাঁর রচিত 'দালায়েলুন্নিযাম' গ্রন্থটির অধ্যয়নে মূলনীতি আয়ত্ত করার ব্যাপারে জ্ঞানীদের জন্য তেমন কোন জটিলতা থাকবে না। কিন্তু এই মূলনীতিগুলোর যথার্থ প্রয়োগ এবং তার দ্বারা উপকৃত হওয়াটা জ্ঞানার্জনের আগ্রহ এবং অন্বেষার ওপরই নির্ভরশীল।

এ ক্ষেত্রে আমরা যে সেবাটুকু করতে পারি তা হল শুধু এই যে, এমন কিছু কিছু ইশারা-ইঙ্গিত দিয়ে দেয়া, যা বিন্যাসানুসন্ধানে সহায়ক হতে পারে। আমাদের ধারণা মতে বিন্যাসের অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনটি কারণে সর্বাধিক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। সেগুলো সম্পর্কেই কিছু উপকারী ইঙ্গিত দিয়ে দেয়া প্রয়োজন। সেগুলো যদি বাস্তবায়িত করা যায়, তা হলে অনেক জটিলতারই সমাধান হয়ে যাবে।

সর্বপ্রথম যে বিষয়টির দরুন মানুষ কোরআনের বিন্যাসের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠতে পারে না, তা হল, প্রাচীন আরবী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে পরিচয়হীনতা। আরবী ভাষায় বিশ্লেষণ ও সংক্ষেপায়ন এবং দীর্ঘায়ন ও হ্রস্বায়নের যে রীতি রয়েছে এবং যেগুলোকে আরব বাগ্মী ও বাকশিল্পীরা অত্যন্ত স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতেন, আমরা নিজেদের ভাষায় সাধারণত সে বিষয়গুলোর সাথে যথার্থভাবে পরিচিত নই। সেজন্যে কোরআনে যখন সেগুলোর সম্মুখীন হতে হয়, তখন তা আমাদের আয়ত্তে আসে না। উন্নত মানের আরবী সাহিত্যের সাথে

www.icsbook.info

যাদের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে তাঁরা জানেন, আরবী ভাষায় কিভাবে একটা বিশেষ বিন্দু থেকে কথা আরম্ভ হয় এবং কথার পিঠে কথা তৈরী হতে থাকে। এমনকি একটা বিশেষ সীমারেখায় পৌঁছে গিয়ে তা আবার সেই কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরে আসে। একদিকে এই বিস্তৃতি অপর দিকে তারই মধ্যে সংক্ষেপায়ন ও হ্রস্বায়নের বিচিত্র কলাকৌশল থাকে বিদ্যমান, যার সাথে একমাত্র আরবী সাহিত্য বিশারদরাই পরিচিত হতে পারেন। অন্যদের পক্ষে এসব বিষয় বুঝা কঠিন। একটা দাবী উত্থাপিত হয় আর তারই সঙ্গে সঙ্গে আলোচিত হয় তার দলিল-যুক্তি। কিন্তু পরিষ্কার করে দেয়া হয় না যে, এটাই তার প্রমাণ। বরং এ বিষয়টি শুধু বর্ণনা প্রেক্ষিতের ভরসার ওপরই ছেড়ে দেয়া হয়। তেমনিভাবে একটা উত্তর দেয়া হবে, কিন্তু এ কথা পরিষ্কার করে বলা হবে না যে, এটা অমুক প্রশ্নের উত্তর কিংবা অমুক সন্দেহের জওয়াব। এ বিষয়টিকেও বর্ণনার আনুপূর্বিক সম্পর্ক কিংবা শ্রোতার মেধার ভরসার ভিত্তিতেই বর্জন করা হবে। কখনও কোন বিশেষ প্রাসঙ্গিক বর্ণনার ভেতরে দৃষ্টি আকর্ষণ হিসেবে কিংবা অপ্রাসঙ্গিকভাবে একটি বাক্য চলে আসবে এবং তা কোন কোন সময় এতই সুদীর্ঘ হবে যে, শ্রোতা যদি অন্যমনস্ক হন, তা হলে হয়ত মূল প্রসঙ্গই হারিয়ে ফেলবেন। একটি কাহিনী কিংবা উপাখ্যান বলা হবে এবং তার ভেতরকার সমস্ত অংশই বাদ দিয়ে দেয়া হবে, সেগুলো একজন বিচক্ষণ শ্রোতার পক্ষে নিজেই জুড়ে নেয়া উচিত। অনেক সময় কিছু বিশেষ পরিণতি সামনে রেখে একটি কথা বলে দেয়া হবে, কিন্তু এ কথা বলা হবে না যে, কথাটি কোন্ বিষয়ের প্রেক্ষিতে এখানে বলা হল।

এ ধরনের অসংখ্য দিক রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে কোন লোক ততক্ষণ পর্যন্ত যথার্থভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠতে পারে না যতক্ষণ না প্রাচীন আরবী সাহিত্য এবং জাহেলিয়াত আমলের বাগ্মী-বক্তাদের রচনা বা বক্তব্যের সাথে ভালভাবে পরিচিত হবেন। আর কোরআন যেহেতু উন্নততর আরবী সাহিত্যের যাবতীয় পবিত্র বৈশিষ্ট্যসমূহে মন্ডিত, সেহেতু এসকল বিষয়ের অজ্ঞতা কোরআনের বিন্যাস উপলব্ধির পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়ত যে কারণে কোরআনের বিন্যাস বুঝতে গিয়ে অত্যন্ত কষ্ট পোহাতে হয়, তা হল সাধারণত মানুষ এ বিষয়টি নির্দিষ্ট করতে পারেনি যে, কোরআন মজীদ কোন্ শ্রেণীর কালাম বা রচনা? এটা কি সে ধরনেরই কোন রচনা যে ধরনের হয়ে থাকে শাস্ত্রীয় রচনাসমূহ? কিংবা এটা কি কবিদের রচনার মত?

www.icsbook.info

অথবা গণকদের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন বিষয়? এর ধরনটা কি বক্তাদের বক্তৃতার মত? আরবের কাফেররা একে কবি এবং গণকদের বাকরীতির সাথে তুলনা করত। আর ইদানীংকার লোকেরা সাধারণত এতে একটি শাস্ত্রীয় রচনাশৈলীর সন্ধান করে। অথচ এতদুভয়ের একটিও যথার্থ নয়। কোরআন মজীদ যদি উল্লিখিত কোন এক শ্রেণীর রচনার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তা হলে সেটি হচ্ছে তৎকালীন আরব বাগ্মীদের কালাম। কিন্তু এ শ্রেণীর সাথেও তার সম্পর্ক একান্ত আপেক্ষিক। এ কথা বলা কিন্তু ঠিক হবে না যে, সম্পূর্ণতই এটা বাগ্মীদের বক্তব্যের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত।

একে বাগ্মীদের বক্তৃতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলতে গিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোরআনের প্রতিটি সূরা তার পরিবেশের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। কাজেই এ বিষয় বুঝার জন্য সবচাইতে প্রয়োজনীয় কথা হল, প্রথমে সে পরিবেশকে বুঝতে চেষ্টা করা যে পরিবেশের তাগিদে বা যে পারিপার্শ্বিকতার প্রেরণায় তার অবতরণ ঘটেছিল। সে পরিবেশ বুঝার লক্ষ্যে কখনও কোরআন বহির্ভূত কোন কিছুর অপেক্ষা রাখে না। এ পরিবেশ স্বয়ং কোরআনের আলোকেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তবে এটা সাব্যস্ত করার প্রয়োজন আছে যে, সে তাগিদ বা প্রেরণাগুলো কি; যা এই কালামের দাবী রাখতে পেরেছে? এই তাগিদগুলো যখন নির্ধারিত হয়ে যায়, তখন সে সূরার বিন্যাসও সুস্পষ্টভাবে সামনে এসে হাযির হয় এবং কালাম তার পরিবেশের সাথে এমন সুন্দরভাবে খাপ খেয়ে যায় যে, তখন যেকোন লোক স্বতস্ফূর্তভাবে চিৎকার করে ওঠে– এই জামাটি সেই শরীরের জন্যই তৈরী হয়েছিল

অনেকে এই তাগিদ বা প্রেরণাগুলো নির্ধারণ করতে গিয়ে শানে নুযূল সংক্রান্ত সেসব রেওয়ায়েতের শরণাপন্ন হন যা তফসীরের কিতাবসমূহে উদ্ধৃত রয়েছে। কিন্তু এ রীতিটি একান্তই ভুল। শানে নুযূল সংক্রান্ত রেওয়ায়েতগুলো কোরআনের বিন্যস্ততা বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী কারিকার অধিকারী এবং এগুলোর বেশীর ভাগই ভিত্তিহীন। কাজেই এ ব্যাপারে কোরআনের ইশারা-ইঙ্গিতের আলোকেই আসল পটভূমিকা বুঝে নিতে চেষ্টা করা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম ও সঠিক পন্থা। কালাম কাদেরকে সম্বোধন করছে? এবং যাদেরকে সম্বোধন করছে তাদের মধ্যে কাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে করছে আর কাদেরকে পরোক্ষভাবে? সে কোন্ জটিলতা সম্বোধিত ব্যক্তি যার সম্মুখীন এবং সে জটিলতার দরুন কি কি

www.icsbook.info

প্রশ্ন তুলেছে, যার উত্তরের জন্য শত্রু-মিত্র সবাই অপেক্ষা করে আছে? তা ছাড়া শত্রুদের বিরোধিতা কোন্ পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছে আর মিত্রতা রয়েছে কোন্ পর্যায়ে? বিরোধীদের দলে কোন্ কোন্ দল কি কি অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এসে যোগ দিয়েছে? এবং স্বপক্ষীয় দলগুলো কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা করছে? এ বিষয়গুলো যখন জানা হয়ে যাবে, তখন কালামের সমস্ত বিন্যাস আপনা থেকেই সামনে এসে উপস্থিত হবে। এসব বিষয়ই কালামের ব্যাকরণের ভেতর থেকে কথা বলে। কাজেই পরিশ্রম করে যদি সেগুলো নির্দিষ্ট করে নেয়া যায় তখন কোরআনের একটি সূরা পাঠ করে মনের মধ্যে এমন অবস্থারই সৃষ্টি হয় যা একজন অতি উত্তম বক্তার অতি উত্তম বক্তৃতা শুনেও সৃষ্টি হয় না।

এ প্রসঙ্গের তৃতীয় জটিলতাটি হচ্ছে সম্বোধনের জটিলতা। কোরআন মজীদের ওপর যারা গভীরভাবে চিন্তা করেন, তারা যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশী জটিলতার সম্মুখীন হন, তা হল কোরআনে খানিক পরে পরে বরং কোন সময় একই আয়াতের মাঝে সম্বোধনের পরিবর্তন হতে থাকে, এ মাত্র মুসলিমদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছিল, এখনই মুশরিকদের করা হচ্ছে। এখনই আলোচনা চলছিল আহ্লে কিতাবদের (যারা কোন আসমানী কিতাবের অনুসারী তাদেরকেই আহলে কিতাব বলা হয়।) হঠাৎ মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে। এখনই একবচনের পদ ব্যবহৃত হচ্ছিল– অমনি বহুবচনে চলে এল। এমনিভাবে সম্বোধনের পটও পরিবর্তিত হতে থাকে। এখনই সম্বোধন করা হচ্ছিল সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে, হঠাৎ তা পরিবর্তিত হয়ে রসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে গেল। এখনই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখ দিয়ে কোন বিষয় আলোচিত হচ্ছিল, সহসা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর মুখ থেকে নিঃসৃত হতে লাগল। যাদের সম্বোধন করা হচ্ছে এবং যে সম্বোধন করেছেন তাদের এই পরিবর্তিত হতে থাকা একজন নবাগতকে অত্যন্ত হতবুদ্ধি করে দেয়। তা ছাড়া এহেন দ্রুত বিবর্তনের মুখে বিন্যাসধারা বজায় রাখা খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

কোরআন মজীদ অনেকাংশে আরব বাগ্মীদের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেভাবে একজন বক্তা শুধু নিজের দিক পরিবর্তন এবং চোখের ঘূর্ণন ও ভ্রূর সংকোচনের দ্বারা, বরং কোন কোন সময় কথার ধারা পরিবর্তন এবং সাধারণ চাহনিতে নিজের সম্বোধনের ধারা বক্তৃতার ভেতরেই পরিবর্তন করতে থাকেন, তেমনিভাবে কোরআন মজীদেও সম্বোধানের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আর যদি

www.icsbook.info

পাঠক কালামের পটভূমির প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারে তা হলে সম্বোধনের বিবর্তনের কারণে কোন ঝামেলা-জটিলতারই সম্মুখীন হতে হয় না বরং তখন তিনি কালামের গতিধারার-সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্বোধনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে থাকেন। কিন্তু এর কোন কোন দিক রয়েছে, যা সহজে সবার আয়ত্তে আসে না। তা ছাড়া সেগুলো আয়ত্ত করার জন্যে প্রচুর অনুশীলন ছাড়া আয়ত্তে আসতেও পারে না।

এখানে আমরা মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী (রঃ)-এর তফসীর নিযামুল কোরআনের ভূমিকা থেকে এবং সম্বোধনের লক্ষ্য নির্ধারণ বিষয়ক পরিচ্ছেদ থেকে প্রয়োজনীয় সার-সংক্ষেপ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, যাতে এই জটিলতার সমাধানে অনেকটা সাহায্য লাভ হতে পারে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে মাওলানা বলেনঃ

> মুসলমানমাত্রই এ বিষয়ে একমত যে, সমগ্র কোরআন আল্লাহ্ তাআলার কালাম। অর্থাৎ, একে আল্লাহ্ রসূলে করীম (সঃ)-এর ওপর নাযিল করেছেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সমগ্র কোরআনের সমস্ত সম্বোধনই আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকেই হয়েছে। যেমন,
>
> إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
>
> আমরা তোমারই বন্দেগী করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

আয়াতে পরিষ্কারভাবেই সম্বোধনটি রয়েছে বান্দাদের পক্ষ থেকে। আলেমগণ এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্ তাআলা এ সূরাটি বান্দাদেরকে শিখিয়েছেন যে, এভাবে বল। কিন্তু এখানে 'বল' কথাটি উহ্য। কাজেই (তাদের) সে বিশ্লেষণকে কেমন করে স্বীকার করা যায়? এমনি প্রশ্ন সৃষ্টি হয় সম্বোধনের লক্ষ্যের ব্যাপারেও। অর্থাৎ, সম্বোধন কাকে করা হচ্ছে? প্রত্যেক সম্বোধনেরই দুটি দিক হতে পারে। প্রথমত এই যে, সম্বোধনটি কোন্ দিক থেকে হয়েছে। দ্বিতীয়ত সম্বোধনটি কার প্রতি? আর এতদুভয়টি কখনও হয় সাধারণ কিন্তু উদ্দেশ্য থাকে নির্দিষ্ট। আবার কখনও হয় নির্দিষ্ট কিন্তু উদ্দেশ্য থাকে সাধারণ। আর যেহেতু এই পরিবর্তন এবং নির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতার দরুন অর্থের দিক দিয়ে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে যায়, সেজন্যে এগুলোর নির্ধারণকল্পে এমন মূলনীতি অনুসন্ধান করা আবশ্যক যা যেকোন জটিলতায় পথ প্রদর্শন করতে পারে।

সম্বোধনে একটি থাকে উৎস আর একটি থাকে অন্ত। উৎস আল্লাহ্ তাআলা হবেন অথবা জিবরাঈল (আঃ) কিংবা রসূল (সঃ) বা মানুষ। তেমনিভাবে অন্তও

www.icsbook.info

হয় হবেন আল্লাহ্ তাআলা, না হয় রসূলে করীম (সঃ) অথবা মানুষ। মানুষের মধ্যে মুসলমান হবেন অথবা মুনাফেক। আহলে কিতাব হবে অথবা হযরত ইসরাঈলের বংশধর কিংবা এদের মধ্য থেকে দুটি, তিনটি অথবা সব ক'টি। আহলে কিতাবের মধ্যে হয় হবে ইহুদী, না হয় হবে নাসারা (খ্রীস্টান) অথবা উভয়টি। এটা তো গেল প্রকাশ্য দিক। এখন এ সমুদয়ের সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, উৎসতে আল্লাহ্, রসূল এবং জিবরাঈলের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে। এক্ষেত্রে যদি কেউ পরিপূর্ণ নিবিষ্টতা ছাড়া কোরআন পাঠ করতে থাকে, তা হলে তার পক্ষে এই পার্থক্য করাই কঠিন হয়ে পড়বে যে, আসলে বক্তা কে? নবী করীম (সঃ) এবং হযরত জিবরাঈল হলেন আল্লাহ্র রসূল বা দূত। তাঁরা কখনও প্রেরকের বক্তব্য উদ্ধৃত করেন আবার কখনও সে বক্তব্যটি নিজেই সম্পাদন করে দেন, যা আল্লাহ্ তাআলা তাদের মুখে প্রকাশ করিয়েছেন। হযরত জিবরাঈলও আল্লাহ্রই দূত। তিনি কখনও নবী করীম (সঃ)-এর সাথে শুধুমাত্র আল্লাহর বাণীর প্রচারক হিসেবে কথা বলেন, আবার কখনও তাঁর শিক্ষক হিসেবে।

কোরআন মজীদে এ সমস্ত দিক বা অবস্থাগুলোই একটা অপরটার সাথে মিলেমিশে কোন রকম সতর্কতা ব্যতিরেকেই প্রকাশ পেতে থাকে। ফলে এগুলো নির্দিষ্ট করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে বক্তব্যের যোগসূত্র ছাড়া এ ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করার মত অন্য কোন সূত্রই নেই। তা ছাড়া এ বিষয়টি বিশেষভাবে কোরআন মজীদের বেলায়ই নয়, বরং এটা আসমানী গ্রন্থসমূহের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়।

এ ব্যাপারে সাধারণ নিয়ম হল যে, কালাম বা বক্তব্য যখন প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে হবে, তখন তাতে মহত্ত্ব, আতঙ্ক, শক্তি ও আড়ম্বরের প্রকাশ থাকবে। সেজন্যে এ ধরনের বক্তব্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝে নেয়া প্রয়োজন। সূরা 'ইকরা'-র শুরু হয় হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর মুখ থেকে। কিন্তু যখন কাফেরদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশের ক্ষেত্র উপস্থিত হয়, তখন সরাসরিভাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়ে যায়। বলা হয় ঃ

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ.

কিছুই নয়, যদি ফিরে না আসে, তা হলে আমি তাকে জুটি ধরে হেঁচড়ে নেই।

www.icsbook.info

অন্তের বেলায় সংমিশ্রণ ঘটে নবী করীম (সঃ) এবং মুমিনদের মধ্যে। কোন কোন সময় বাহ্যত মনে হয় সম্বোধন হুযূরের প্রতি হচ্ছে, অথচ বক্তব্যের লক্ষ্য থাকে উম্মতের দিকে। পয়গম্বর আলাইহিস সালাম যেহেতু উম্মতের প্রতিনিধি বা অভিভাবক হিসেবে তাদের মুখ এবং তাদের কান হওয়ারও মর্যাদা রাখেন, তাই সম্বোধন তাঁকেই করা হয়। তওরাতেও এমন বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, বাহ্যত একবচনের মাধ্যমে হযরত মূসার প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে; কিন্তু বাস্তবে লক্ষ্য হচ্ছে উম্মত। কোরআন মজীদে এ ধরনের যেসব ক্ষেত্র রয়েছে সেখানে বিন্যাস ও বক্তব্যের ধারাবাহিকতার পথনির্দেশন অনুযায়ী-ই বুঝা যায় প্রকৃতপক্ষে সম্বোধনের লক্ষ্য কে। সূরা তওবাতে একটি আয়াত রয়েছে—

اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَا اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ ـ

যদি কোন সফলতা লাভ হয়, তখন তাদের কষ্ট হয়। আর যদি কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তখন বলে, বেশ হয়েছে; আমরা আগেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে নিয়েছি।

এখানে সম্বোধনটি একবচনের কিন্তু এর উদ্দেশ্য সাধারণ মুসলমান। সুতরাং তার উত্তরেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে। বলছেন ঃ

لَنْ يُّصِيْبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ

বলে দাও, আমাদের প্রতি কোন বিপদই আসবে না কিন্তু যা আল্লাহ্ আমাদের জন্যে লেখে দিয়েছেন তাই আসবে। তিনি আমাদের মালিক, আর যারা ঈমানদার আল্লাহ্র ওপর ভরসা করাই তাদের কর্তব্য।

তেমনিভাবে সূরা বনী ইসরাইলে দৃশ্যত সম্বোধন করা হয়েছে নবী করীম (সঃ)-কে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্বোধনের লক্ষ্য গোটা উম্মত। বলা হয়েছে ঃ

اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ـ

যদি তোমাদের সামনে তাদের মধ্য থেকে (পিতা-মাতার মধ্য থেকে) একজন কিংবা উভয়েই বৃদ্ধাবস্থায় গিয়ে পৌঁছে, তা হলে তাদেরকে না উহ্ বলবে আর না ধমক দেবে; তাদের সাথে আদরের সহিত কথা বলবে।

www.icsbook.info

এমনি ধরনের বহু উদাহরণ রয়েছে যা প্রকাশ্যে অসাধারণ বা বিশেষ হলেও উদ্দেশ্য তার সাধারণ।

তৃতীয় চূড়ান্ত মূলনীতিটি হচ্ছে কোরআনের তফসীর বা ব্যাখ্যা কোরআনের দ্বারাই করা। কোরআন মজীদ كتابا متشابها শব্দে নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছে। যার অর্থ হল, এর এক অংশ অপর অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোরআন মজীদে একই বিষয় কোথাও সংক্ষিপ্তভাবে, কোথাও বিস্তারিতভাবে, কোথাও শুধু দাবীর আকারে আসে আবার কোথাও দলিল-প্রমাণসহ। কোথাও কোন বিশেষ বিষয়ের সাথে আবার কোথাও অন্য কিছুর সাথে। একই বিষয়ের এত বৈচিত্র্যের সাথে উপস্থাপিত হওয়ার সবচাইতে বড় ফায়দা এই যে, একটি বিষয় এক জায়গায় বুঝা না গেলে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় জায়গাটিতে বুঝে এসে যায়। এক জায়গায় যদি তার কোন একটি বিশেষ দিক স্পষ্ট না হয়, তা হলে অন্য জায়গায়, অন্য ধারায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ কারণেই কোরআনের তফসীরের সবচাইতে নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য উৎস হচ্ছে স্বয়ং কোরআন। কেউ যদি কোরআন জটিলতাসমূহের মীমাংসা স্বয়ং কোরআনেরই মাধ্যমে করতে চেষ্টা করেন, তা হলে কোন একটি জায়গায় যদি কোন বিষয়ের বিন্যাস স্পষ্ট না হয়, তবে অন্যত্র তা স্পষ্ট হয়ে যায়। এক জায়গায় যদি কোন বিষয়ের দলিল পাওয়া না যায়, তবে অন্যত্র তা পাওয়া যায়। এমনকি অনেক সময় তার বর্ণনাভঙ্গি এবং পরিভাষাগত জটিলতাগুলোও বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বারবার সামনে আসার ফলে স্পষ্ট হয়ে যায়। আর যেহেতু কোরআন মজীদের প্রত্যেকটি অংশই সমানভাবে অকাট্য ও চূড়ান্ত, কাজেই এর এক অংশের ব্যাখ্যা অপর অংশের দ্বারা করা হলে তা হয় চূড়ান্তের তফসীর চূড়ান্তের মাধ্যমে। অতএব তখন যে যত বড় বিরোধী বা অস্বীকারকারীই হোক না কেন, কোন রকম কথা বলার অবকাশ কারোই থাকে না।

তফসীরের চতুর্থ অকাট্য ও চূড়ান্ত উৎসটি হচ্ছে প্রসিদ্ধ ও আনুক্রমিক সুন্নাহ। কোরআনের পরিভাষা যেমন, সালাত, যাকাত, ওমরা, হজ্জ, কোরবানী, মসজিদে হারাম, সাফা-মারওয়া, সাঈ, তওয়াফ প্রভৃতির তফসীর আনুক্রমিক সুন্নাহর মাধ্যমেই করা কর্তব্য। কারণ, কোরআন মজীদ এবং শরীয়তের পরিভাষার অর্থ বর্ণনা করার অধিকার হুযুরে আকরাম (সঃ) ব্যতীত অন্য কারো নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, একথা চূড়ান্তভাবে জানা থাকতে হবে যে, হুযূরে আকরাম (সঃ) এসব পরিভাষার ব্যাখ্যা কিভাবে করেছেন। বস্তুত এ বিষয়ের জামানত হচ্ছে এ সমুদয়

www.icsbook.info

পরিভাষার প্রকৃত মর্ম সম্পূর্ণ কার্যকররূপে সুন্নতে মুতাওয়াতেরাহ বা আনুক্রমিক হাদীসের মধ্যে সংরক্ষিত করে দেয়া হয়েছে। আর সুন্নতে মুতাওয়াতেরাহ ঠিক সে সমস্ত মাধ্যমগুলোতে প্রমাণিত, যেসব মাধ্যমে স্বয়ং কোরআন মজীদও প্রমাণিত হয়েছে। উম্মতের যে অনুচ্ছেদ বা আনুক্রমিক বর্ণনা ধারা কোরআনকে আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌছিয়েছে সে বর্ণনাধারাই ধর্মের যাবতীয় পরিভাষার কার্যকর মর্মসমূহকেও আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌছিয়েছে। সুতরাং কোরআন মজীদকে স্বীকার করা যদি আমাদের ওপর ওয়াজিব হয়, তা হলে পরিভাষাসমূহের সেই রূপকে স্বীকার করাও ওয়াজিব, যা পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে বর্ণিত হয়ে পরবর্তীদের কাছ পর্যন্ত এসেছে। এগুলোর রূপে যদি আংশিক কোন মতবিরোধ থেকেও থাকে, তার কোন ধর্মীয় গুরুত্ব নেই। পাঁচ ওয়াক্তের নামায সবাই জানেন এবং মানেন। রইল এটুকু যে, 'আমীন' জোরে বলতে হবে কি আস্তে । তাতে মতবিরোধ হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের মতবিরোধের কোন গুরুত্ব আমাদের ধর্মে নেই। অবশ্য যে বিষয়গুলো একক বর্ণনাধারায় বর্ণিত হয়ে এসেছে, সেগুলোতে যার মন যে দিকটি গ্রহণ করে সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে, তাই গ্রহণ করে নিতে পারেন। পারস্পরিক বিরোধিতা কিংবা একে অন্যকে খন্ডনের পেছনে পড়তে নেই। কিন্তু যে বিষয়গুলো সুন্নতে মুতাওয়াতেরাহ্‌র দ্বারা সপ্রমাণিত ও জ্ঞাত, সেগুলোর বিরোধিতা করা স্বয়ং কোরআনেরই বিরোধিতার শামিল। আর কোরআনের বিরোধিতা যারা করবে আমাদের ধর্মে তাদের জন্যে কোন স্থান নেই।

হাদীসের প্রতি যারা আস্থাহীন–রোযা-নামায, হজ্জ-যাকাত এবং ওমরা ও কোরবানীর মর্ম নিজের মনমত তৈরী করে বর্ণনা করেন; আর গোটা উম্মতের ধারাবাহিক বর্ণনা এসব বিষয়ের যে স্বরূপ সংরক্ষিত করেছে তাতে নিজেদের ব্যপক কামনা-বাসনা অনুযায়ী সংশোধন ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধনে প্রয়াসী হন, তাদের এহেন দুঃসাহস পরিষ্কারভাবে কোরআনকেই অস্বীকার করার নামান্তর। তার কারণ, যে ধারাবাহিকতা বা আনুক্রমিক বর্ণনাধারা কোরআনকে আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌছিয়েছে, পরিভাষাসমূহের কার্যকর প্রয়োগে বা রূপকেও সে ধারাবাহিকতাই আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌছিয়েছে। কাজেই তারা যদি এগুলো স্বীকার না করেন, তা হলে কোরআনকে স্বীকার করার কোন কারণই অবশিষ্ট থাকে না। এ শ্রেণীর মূর্খজনেরা কোরআনী পরিভাষাসমূহের চূড়ান্ত ও অকাট্য

www.icsbook.info

মর্মসমূহকে বদলে দেয়ার যে দুঃসাহস করেছে তার কিছুটা অনুমান সেসব আলোচনার দ্বারা হয়ত হয়ে থাকবে, যা মাঝে-মধ্যেই কোরবানী সম্পর্কে এক শ্রেণীর (জ্ঞানান্ধ) লোকের পক্ষ থেকে পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়ে থাকে। বস্তুত এখন তো তারা দুনিয়া এবং আখেরাত প্রভৃতির মত সর্বজনবিদিত ও প্রসিদ্ধ বিষয়ের মর্মও নিজেদের উদ্দেশ্য ও বাসনা অনুযায়ী গড়ে নিয়েছেন। তাদের মতে, দুনিয়া অর্থ উপস্থিত বা বর্তমান, আর আখেরাত অর্থ ভবিষ্যত। আর কোরআনে নিজের কল্যাণের জন্য ব্যয় করার যে নির্দেশ রয়েছে তার অর্থ এই করা হয় যে, সব কিছুই নিজের বর্তমান প্রয়োজনেই ব্যয় করে ফেলো না, বরং ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য কিছু ব্যাঙ্কেও জমা করে রাখ।

এ প্রসঙ্গে মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী (রঃ) তাঁর তফসীর নিযামুল কোরআনে উল্লেখ করেন ঃ

"এমনিভাবে যাবতীয় শরীয়তী পরিভাষাসমূহ যেমন, নামায, যাকাত, জিহাদ, রোযা, হজ্জ, মসজিদে হারাম, সাফা-মারওয়া এবং হজ্জের মানাসিক প্রভৃতি এবং সেগুলোর সাথে যেসব ক্রিয়াকলাপ সম্পৃক্ত রয়েছে তা সবই ধারাবাহিকতা ও আনুক্রমিকভাবে পূর্ববর্তীদের থেকে পরবর্তীদের পর্যন্ত সুরক্ষিত রয়েছে। এতে সাধারণ আংশিক যে মতানৈক্য রয়েছে তা লক্ষণীয়ই নয়। বিভিন্ন দেশের বাঘের আকার-অবয়বে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বাঘের অর্থ সবাই জানেন। এমনিভাবে যে নামায উদ্দিষ্ট তা সে নামাযই যা মুসলমানরা পড়েন। যতই না কেন তার রূপে কোন কোন আংশিক বিরোধ থাক। যারা এধরনের সাধারণ বিষয়ে খোঁজাখুঁজি করে, তারা এই দ্বীনে কাইয়্যম বা সুদৃঢ় ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কেই সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ, যার শিক্ষা কোরআন মজীদ দিয়েছে।

সুতরাং যখনই এ ধরনের পারিভাষিক শব্দের বিষয় উপস্থিত হবে, যার পূর্ণ সীমারেখা এবং চিত্ররূপ কোরআন মজীদে বর্ণিত হয়নি, তখন সঠিক পন্থা হবে, তার যতটা অংশের ব্যাপারে সমগ্র উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে ততটাই গ্রহণ করে নিতে হবে। একক বর্ণনার হাদীসসমূহের প্রেক্ষিতে কোন রকম গোঁড়ামি অবলম্বন করা ঠিক নয়। কারণ, তার ফলে নিজেকেও সংশয়ের সম্মুখীন হতে হবে, আর অন্যের কার্যকলাপও ভুল বুঝতে বাধ্য করবে; অথচ এর মীমাংসার জন্যে এমন কোন বিষয় থাকবে না যার মাধ্যমে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

www.icsbook.info

তফসীরের অনুমানভিত্তিক উৎস ঃ

এখানে তফসীরের অনুমানভিত্তিক কতিপয় উৎস সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব। অনুমানভিত্তিক বলতে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেসব উৎস, যার ওপর সর্বাবস্থায় পুরোপুরি নির্ভর করা যায় না; বরং সেগুলোর ভেতরে যেহেতু অনুমান ও সন্দেহ-সংশয়ের সংস্পর্শ রয়েছে, সেজন্যে কোরআনের তফসীরের বেলায় সেগুলোকে ততটুকুই গুরুত্ব দেয়া বাঞ্ছনীয় যতটুকু কোরআনের সাথে আনুকূল্য বিধান করবে। তার কোন বিষয় যদি কোরআনের বিরুদ্ধে যায়, তা হলে সেক্ষেত্রে সেগুলো বর্জিত হবে এবং কোরআনের কথাই হবে চূড়ান্ত।

১. কোরআন তফসীরের অনুমানভিত্তিক উৎসগুলোর মধ্যে সর্বাধিক ও পবিত্র উৎসটি হল বিভিন্ন দুর্বল বর্ণনার মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদীসে রসূল এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণী। এগুলোর বিশুদ্ধতা ও যথার্থতার ব্যাপারে যদি পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়া যেত, তা হলে তফসীরের ক্ষেত্রে এগুলোর মর্যাদাও ঠিক ততটাই হতে পারত যতটা সুন্নতে মুতাওয়াতেরাহ্‌র রয়েছে। কিন্তু যেহেতু এগুলোর সঠিকতার ব্যাপারে পূর্ণ ভরসা করা যায় না, সেহেতু তফসীর করতে গিয়ে এগুলোর মধ্য থেকে ততটুকুই গ্রহণ করা যাবে যতটুকু সে সমস্ত চূড়ান্ত ও অকাট্য মূলনীতিসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। সাধারণভাবে বর্ণিত হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের 'আসার'কে গুরুত্ব দিতে গিয়ে যারা কোরআনের ওপরে নিয়ে দাঁড় করায়, তারা প্রকৃতপক্ষে কোরআনকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। অথচ তাতে হাদীসের মর্যাদাও বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে যারা আদপেই হাদীসকে অস্বীকার করে বসেন তারা সে আলো থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে পড়েন, যা কোরআন মজীদের বহু সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বিশ্লেষণে সর্বাধিক সহায়ক হতে পারত। এ ব্যাপারে মধ্যম পন্থা হচ্ছে, কোরআন মজীদের সংক্ষিপ্ততার বিশ্লেষণে যেসমস্ত বিশুদ্ধ ও যথার্থ হাদীস সহায়ক হতে পারে, সেগুলোর সাহায্য গ্রহণ করা এবং সেগুলোর মোকাবিলায় অন্য কোন বিষয়কে স্থান না দেয়া। আর হাদীস যদি সুস্পষ্টভাবেই কোরআনের শব্দাবলীর এবং তার বিষয়বস্তুর বিন্যাসধারার বিরোধী হয়, তবে সেসব ক্ষেত্রে বিরত থাকতে হবে। সেসব অবস্থাতে হাদীসকে বর্জন করাই কর্তব্য, যাতে দেখা যাবে, কোরআনের শব্দের সাথে কোনক্রমেই তার সমন্বয় হতে পারছে না। অথবা ঐ হাদীসটি মানতে গেলে দ্বীনের এমন কোন মূলনীতির প্রতি আঘাত আসে, যা মান্য করা অপরিহার্য। সহীহ্ বা বিশুদ্ধ হাদীস

www.icsbook.info

বলতে যা বুঝায় এমন খুব কমই দেখা যায়, কোরআনের সাথে যার সামঞ্জস্য হতে পারে না। যাই হোক, এমন সব ক্ষেত্রে কোরআনকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই তার এ অগ্রাধিকারকে উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু এমন ক্ষেত্র খুব বেশী নেই।

শানে নুযূল সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়েত রয়েছে, সেগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর ব্যাপারে এই মূলনীতিগত বাস্তবতার প্রতিও লক্ষ্য রাখা কর্তব্য যে, আমাদের প্রাচীন ওলামা-মনীষীবৃন্দ কোন আয়াতের শানে নুযুলের ব্যাপারে যে নির্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করেন তাতে তাঁদের উদ্দেশ্য এমন থাকে না যে, হুবহু এ ঘটনাটিই এ আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। বরং তাতে সাধারণত তাঁদের উদ্দেশ্য থাকে যে, এ ধরনের ঘটনার ব্যাপারে যে কি নির্দেশ তা এ আয়াতে রয়েছে। এই বিষয়টির বিশ্লেষণ আমাদের তফসীরের বিশিষ্ট আলেমগণ করেছেন। তাতে শানে নুযূল সম্পর্কিত বেশীর ভাগ জটিলতারই সমাধান হয়ে যায়। শানে নুযূলের প্রতি শুধু সে সকল ক্ষেত্রেই গুরুত্ব দেয়া উচিত যেখানে কোরআন কোন নির্দিষ্ট ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে থাকবে। যেম,ন সূরা তাহ্‌রীম কিংবা আহযাবে কোরআন কোন কোন ঘটনার প্রতি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করেছে। এ ধরনের ঘটনার সবিস্তার বিবরণ হাদীস থেকে জেনে নেয়া বাঞ্ছনীয়, যা কোরআনের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর সে বিষয়গুলো উপেক্ষা করা উচিত, যা স্বীকার করতে কোরআন বাধা দেয় অথবা তা মেনে নিলে এমন সব ব্যক্তির জীবনে কোন কথা আসে যাদের জীবনের সম্পূর্ণ পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা সম্পর্কে স্বয়ং কোরআন সাক্ষ্য দিয়েছে।

২. এমনিভাবে বিভিন্ন জাতির প্রমাণিত ইতিহাস দ্বারাও কোরআনের তফসীরে সাহায্য নেয়া বাঞ্ছনীয়। কোরআন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জাতিসমূহের ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। কোথাও আরবের প্রাচীন জাতি আদ, সামুদ, মাদইয়ান ও কওমে লূত প্রভৃতির ধ্বংসের আলোচনা করেছে, কোথাও হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মক্কায় আগমন, সেখানে বসতি স্থাপন ও খানায়ে কাবার নির্মাণের ঘটনাবলীর প্রতি আরববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আবার কোথাও ইহুদী-নাসারাদের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর প্রতি ইশারা করেছে। কোথাও কোথাও কোরআনের অবতরণকালীন কোন কোন জাতি এবং তাদের বিশেষ বিশেষ অবস্থার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা

www.icsbook.info

হয়েছে। এমনিভাবে অসংখ্য ঐতিহাসিক ঘটনা বা বিষয় রয়েছে, যা কোন না কোনভাবে কোরআনে আলোচিত হয়েছে। এই সমুদয় ইঙ্গিত-ইশারা স্পষ্ট করে বুঝতে হলে সেসব জাতির ইতিহাস এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটিভাবে ওয়াকিফহাল হওয়া আবশ্যক। তা না হলে সেসব উদ্দেশ্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যায় না, যে জন্যে কোরআন মজীদ এসব ঘটনা বর্ণনা করেছে।

কোরআন মজীদের কোন কোন বিষয়ের বিশ্লেষণকল্পে আমাদের সেসব ঐতিহাসিক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু তার প্রমাণিত অংশ খুবই অল্প। কাজেই সেগুলোর যাচাইয়ের জন্যও আমরা কোরআনকেই কষ্টি পাথর হিসাবে নির্দিষ্ট করতে পারি। অর্থাৎ তার যেসব কথা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী হবে সেগুলোকেই আমরা গ্রহণ করব আর যা কোরআনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে সেগুলো বর্জন করব।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করলে আমরা অনুমান করতে পারব যে, কোরআন মানবতা ও গোটা মানব জাতির প্রতি যে মহান করুণা করেছে, তা ছাড়াও সে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের প্রতি যে অবদান রেখেছে, সারা বিশ্ব মিলে যদি সেগুলোর জন্য কৃতজ্ঞতা বা শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে চায় তবুও তার যথার্থ প্রাপ্য শোধ করা সম্ভব হবে না। আমাদের ইতিহাসশাস্ত্র ছিল সম্পূর্ণভাবে একটা নিষ্প্রাণ বিষয়। তা থেকে মানুষ যদিও কিছু পেত তবে তা ছিল শুধুমাত্র ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনার রূপকথার আকারে পুনরাবৃত্তি এবং তা থেকে সাময়িকভাবে বাপ-দাদাদের গৌরবের অনুভূতি কে একটা সান্ত্বনা দেয়া। কোরআন ইতিহাসকে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছে। সে তাকে জাতিসমূহের উত্থান ও পতনের এক শিক্ষামূলক উপাখ্যান হিসেবে পেশ করেছে এবং খন্ডনের অযোগ্য যুক্তি-দলিল দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, জাতির উত্থান-ওপতনের প্রকৃত কারণ হচ্ছে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চরিত্র। ইতিহাসকে নতুন এই আঙ্গিক দান করে কোরআন সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসকে ইতিপূর্বে প্রচলিত সাধারণ গল্প-কাহিনীর ন্যায় গুরুত্বহীন পর্যায় থেকে উত্তরিত করে গোটা দুনিয়ার পথ প্রদর্শন ও হেদায়াতের জন্যে সর্বাধিক মূল্যবান উপকরণে পরিণত করে দিয়েছে। বিশেষভাবে বনী ইসরাঈল এবং বনী ইসমাঈলদের ইতিহাসের প্রতি কোরআন যে অনুগ্রহ করেছে তার জন্যে গোটা দুনিয়াকেই তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কারণ, এই জাতিদ্বয়ের ইতিহাস শুধু জাতির ইতিহাসই ছিল না, বরং প্রকৃতপক্ষে

www.icsbook.info

তা ছিল বিশ্বের কল্যাণকল্পে আবির্ভূত সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবী-রসূলগণের অবদানের ইতিহাস। আর এই ইতিহাসের বিকৃতি (যেমনটি হয়েছিল আরব ও ইহুদীদের হাতে) পৃথিবীর জন্যে ছিল একটা বিরাট দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। এতে হেদায়াত ও পথপ্রাপ্তির সেসমস্ত মাইলফলক নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল যা আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দারা মানবতাকে পথের দিশা দেয়ার জন্য স্থাপন করেছিলেন। এটা কোরআন মজীদেরই একক অবদান যে, সে ইতিহাসের মুছে যাওয়া সেসব চিহ্নগুলো উদ্ধার করে এমনভাবে পুনঃস্থাপন করেছে যে, কেয়ামত পর্যন্তের জন্য প্রতিটি ফলক চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

তফসীরের অনুমানভিত্তিক উৎসগুলোর মধ্যে তৃতীয়টি হচ্ছে প্রাচীন আসমানী গ্রন্থরাজি। এ সত্য কেউই অস্বীকার করতে পারেন না যে, আমাদের নবী করীম (সঃ) নবী-রসূলগণেরই একজন এবং এই কোরআন মজীদ আসমানী গ্রন্থরাজিরই একটি গ্রন্থ। সুতরাং কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অন্যান্য আসমানী গ্রন্থসমূহ থেকে অত্যন্ত মূল্যবান সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। হেদায়াতপ্রাপ্তির ব্যাপারে এখন আর আমরা প্রাচীন গ্রন্থসমূহের মুখাপেক্ষী রইনি। হেদায়াত ও পথ প্রদর্শনের উদ্দেশে যাবতীয় ত্রুটি থেকে মুক্ত আল্লাহ্‌র সর্বশেষ গ্রন্থটিই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। সূর্যোদয়ের পরে যেমন নক্ষত্ররাজি থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকে না– তেমনিভাবে কোরআন অবতীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর হেদায়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে অপর কোন গ্রন্থেরই প্রয়োজনীয়তা থাকে না। কিন্তু এমন কিছু দিক রয়েছে, যার প্রেক্ষিতে আমাদের পক্ষে প্রাচীন আসমানী গ্রন্থসমূহের ব্যাপারে সরাসরি জ্ঞান অর্জন করা কর্তব্য।

প্রথমত কোরআন মজীদের বহু বাণীর বিশ্লেষণকল্পে আমাদের ওলামা সম্প্রদায়কে আহলে কিতাবদের রেওয়ায়েত নিতে হয়েছে। আর সেই রেওয়ায়েতগুলো যেহেতু সম্পূর্ণতই শোনা কথার ওপর নির্ভরশীল, সেজন্যে সেগুলোর তেমন বৈজ্ঞানিক মূল্য-মর্যাদা নেই। সেগুলো না আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে কোন দলিল হতে পারে, আর নাই বা আমরা নিজেদের কোন দাবী কিংবা যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তি সেগুলোর ওপর স্থাপন করতে পারি। কাজেই সরাসরি সেসব আসমানী গ্রন্থ ও পুস্তক-পুস্তিকার জ্ঞান লাভ করা আমাদের জন্যে প্রয়োজন-যাতে সেসব বিষয়ে কোন কিছু বলতে গেলে তা জেনে শুনে বলতে পারি।

দ্বিতীয়ত কোরআন মজীদ অতীত গ্রন্থসমূহের শিক্ষাকে পরিপূর্ণ করে তোলে এবং সেগুলোতে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে তার সংশোধন দান

www.icsbook.info

করে। কাজেই কেউ যখন কোরআনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গ্রন্থগুলোও অধ্যয়ন করে, তখন কোরআনের মহত্ত্ব ও গুরুত্ব অনেক বেশী পরিমাণে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং কোরআনের মাধ্যমে এই উম্মতের প্রতি আল্লাহ্ যে কত-বড় অনুগ্রহ করেছেন, তা এক বৈচিত্র্যময় প্রক্রিয়ায় উদ্ভাসিত হয়।

তৃতীয়ত কোরআনে হাকীম বিধি-বিধানের বর্ণনা প্রসঙ্গে এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর আলোচনাক্রমেও বিভিন্ন স্থানে এমন সব ইশারা-ইঙ্গিত করেছে, যেগুলো প্রাচীন আসমানী কিতাবাদির অভিজ্ঞতা ছাড়া পুরোপুরিভাবে স্পষ্ট হতে পারে না। আমাদের মহামান্য মুফাস্‌সেরীনের অধিকাংশই যেহেতু তওরাত ও ইঞ্জীল-এর সাথে সরাসরিভাবে পরিচিত ছিলেন না, সেহেতু তাঁরা ঐ ধরনের ইঙ্গিত-ইশারার পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ দিতে পারেননি।

চতুর্থত কোরআন মজীদও নাসারাদেরকে এ বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত করেছে যে, তারা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত গ্রন্থের বিকৃতি সাধন করেছে। সেগুলোর ভেতরে এমন বহু বিষয় সংযুক্ত করে দিয়েছে যা ইতিপূর্বে তাতে ছিল না। আর কিছু বিষয় সেগুলোর ভেতর থেকে বের করে দিয়েছে যা ইতিপূর্বে যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে তাতে বর্ণিত ছিল। এমনকি অসংখ্য ব্যাপার রয়েছে যাতে তারা নিজেদের আচার-আচরণকে আল্লাহ্ ও তাঁর নবী-রসূলগণের নির্ধারিত রীতি-নীতির প্রকাশ্য বিরোধী বানিয়ে নিয়েছে। অনেক নিষিদ্ধকে সিদ্ধ করে নিয়েছে আবার বহু সিদ্ধকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এ ধরনের যাবতীয় বিষয়কে প্রামাণ্য করে তোলার জন্য সরাসরি তওরাত ও ইঞ্জীলের প্রতিও নজর থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় আহ্‌লে কিতাবদের ওপর যথাযথভাবে যুক্তি স্থাপন সম্ভব নয়।

পঞ্চমত এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও প্রাচীন গ্রন্থসমূহে আল্লাহ্ ও আম্বিয়ায়ে কেরামের বাণী সম্বলিত একটা অংশ রয়েছে যা কোরআন মজীদের সাথে পরিচিত ব্যক্তিরা চিনে নিতে পারেন। আল্লাহ্ ও তাঁর আম্বিয়া (আঃ)-এর বাণী সম্বলিত সে অংশটি প্রকৃতপক্ষে মুমিনদেরই একটা হৃত ভান্ডার। আর মুমিনদেরই সে অধিকার যে, যেখানেই তারা সেই ভান্ডারের সন্ধান পাবে, সেখান থেকেই তা সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে।

---

www.icsbook.info

রশীদ বুক হাউজ